জেল থেকে লেখা

সংকলন

দেবেশ চন্দ্র

অনুবাদ

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-3319-4

2000 (শক 1922)

মূল © দেবেশ চন্দ্র

বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

Jel Se Likhe Gaye Patra Ebam Anya Lekh (*Bangla*)

মূল্য : **11.00** টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক

নয়াদিল্লি 110016 কর্তৃক প্রকাশিত

সূচিপত্র

ভূমিকা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে উনিশ শতক এবং বিশ শতকের আরম্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সেই সময় যখন বাণিজ্যের অজুহাতে এসে ইংরেজ এই দেশের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। শাসক হয়ে নিজের স্বার্থের জন্য আমাদের শোষণ করে চলেছে। লোকে এই আমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে বলে ঠিক করেছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ইংরেজ শাসককে আতঙ্কিত করেছে। দমন করা ছাড়া আর কোন উপায় সে ভেবে পাচ্ছে না। একের পর এক আইন বানানো হল। ১৮৬০ সালে 'ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড' আর ১৮৬১ সালে 'অপরাধ নির্দ্ধারক বিধি' চালু হল। এইভাবেই ১৮৭৮ সালে 'ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন' তেরি হল, আর 'ভারতীয় দণ্ডবিধি' ১২৪-এ ও ১৫৩-এ সংযুক্ত হল। আরো পরে, ১৯০৮ সালের ৮ জুন দমনকারী আরো দুটি আইন চালু হল। 'বিস্ফোরক দ্রব্য আইন' এবং 'সংবাদপত্র আইন'। 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' এরই একটি শাখা। 'সংবাদপত্র আইনে' যে কোনো প্রিন্টিং প্রেসকে বন্ধ করার অধিকার জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়া হল। যে কোনো সংবাদ পত্র বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল তাঁকে। লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংকে দেশের বাইরে মান্‌ডালের সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হল। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের দ্বীপান্তর হল। তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে এডেনের কেল্লায় বন্দী করে রাখা হল। দেশভক্তির এই তুমুল স্রোত বিদেশ-বাসী ভারতীয়দের স্পর্শ করল। এই বিশাল ভূখণ্ডে ঐ স্থানগুলিও তখন সংযুক্ত, যাকে পরে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (আরো পরে যা বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে) বলা হল। অনেক ছোট বড় দল তৈরি হল, কিন্তু সকলের উদ্দেশ্য এক—ভারতের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা

আন্দোলনের প্রেরণা আমাদের দেশেই জন্ম নিয়েছিল। বিদেশের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল, তারা আয়ার্ল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইতালি, জর্মানী, ফ্রান্স, রাশিয়া ইত্যাদি দেশের ইতিহাস থেকেও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

প্রথম দিকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী লোকেদের হাতে ছিল। এদের উগ্রবাদী, উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী এইরকম আরো না জানি কত নাম দেওয়া হয়েছিল। এরা আত্মগোপন করে বিপ্লবের পরিকল্পনা করত, এবং পরে তা কার্যকরী করত। অজিত সিং থেকে চন্দ্রশেখর আজাদ পর্যন্ত বিপ্লবীদের নাম এই দীর্ঘ তালিকায় রয়েছে। শচীন্দ্র সান্যালের আত্মকথা 'বন্দী-জীবন', রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের 'আত্মচরিত' এবং বীর সাবরকরের 'মাঝী জনম ঠেপ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে বিপ্লবীদের জীবন বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। বিপ্লবীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল আত্মগোপন, দেশভক্তি, এবং এক আশ্চর্য উন্মাদনা। তাদের জন্য জীবন ছিল এক যাত্রাপথ। বিপ্লবীরা শুধু নিজের পোষাক নয়, নিজের নামও বদলে নিত। এম. এন. রায় এইরকম এক বিপ্লবী ছিলেন, যাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসে ১০ মে ১৯২৪ তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বেরোয়। ২১ জুন, ১৯৩১ তিনি গ্রেপ্তার হন, এবং ২০ নভেম্বর, ১৯৩৬ পর্যন্ত তাঁকে এক জেল থেকে অন্য জেলে পাঠানো হতে থাকে। শ্রী রায়ের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। অনেককেই বিপজ্জনক কয়েদী হিসেবে চিহ্নিত করে বিদেশে ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব জেলে রাখা হত, যাতে দেশবাসীর সঙ্গে এঁদের কোনো রকম সম্পর্ক না থাকে। এডেনের জেল ছাড়াও বর্মাতে (এখন মিয়ানামার) মানডালের সেন্ট্রাল জেল এবং আন্দামান দ্বীপের সেলুলার জেলও ছিল। এই জেলগুলির মধ্যে আন্দামানের সেলুলার জেল মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কষ্ট দেওয়ার জন্যে কুখ্যাত ছিল। এই জেলে বীর সাবরকর এবং তাঁর বড় ভাই গণেশ পন্তকে (বাবা সাবরকর) আজীবন বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তৃতীয় ভাই নারায়ণ দামোদর সাবরকরকে উনিশ বছর বয়সে দীর্ঘ এগার বছরের জন্যে বন্দী করা হয়েছিল। এই জেল থেকে নিজের পরিবারবর্গের কাছে বছরে একটিমাত্র চিঠি লিখতে দেওয়া হত। বীর সাবরকর মোট ন'টি চিঠি লিখেছিলেন, যার মধ্যে আটটি মাত্র

পাওয়া গেছে। তিনি জেলের দেওয়ালের উপর নিজের নোখ ও পাথরের টুকরো দিয়ে প্রায় ছ' হাজার পংক্তি লিখেছিলেন, যা তাঁর সম্পূর্ণ স্মরণে ছিল। এই কবিতাগুলি তিনি জেল থেকে ফিরে আসার পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অদ্ভুত মেধা ও শারীরিক বল ছিল।

মানডালের সেন্ট্রাল জেলের বর্ণনা করে সুভাষ চন্দ্র বসু ২৫ আগস্ট, ১৯২৫-এ এন. সি. কেলকারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেন্সর সেই চিঠি পাঠাতে দেয়নি। চিঠিটি কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রকাশনীতে রয়েছে (এই বইয়ে চিঠিটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে)। সুভাষ চন্দ্র বসুকে ১৯২৫ সালে বহরমপুর জেল থেকে এখানে আনা হয়েছিল। উনি ১৯২৭ পর্যন্ত এখানে ছিলেন। তার আগে লালা লাজপত রায়, অজিত সিং এবং বাল গঙ্গাধর তিলক এখানে থেকে গেছেন। তিলক ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ থেকে ৮ জুন, ১৯১৪ পর্যন্ত এখানে ছিলেন। এখানেই উনি পেন্সিল দিয়ে ন'শো পৃষ্ঠার 'গীতা-রহস্য' রচনা করেছিলেন, এবং নিজের পরিবারবর্গকে আটটি চিঠি লিখেছিলেন। তিলক, সাবরকর ও সুভাষ চন্দ্র বসুর পত্রে দেশভক্তির উষ্মা রয়েছে, প্রিয়জনকে ছেড়ে যাওয়ার অশ্রু নয়।

দেশের স্বাধীনতায় সশস্ত্র বিপ্লবের তাৎপর্য কী—এই বিষয়ে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৯ সালে তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তার উত্তরে ভগত সিং নিজের ও বন্ধু বটুকেশ্বর দত্তের তরফ থেকে একটি চিঠি ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৯-এ শ্রী চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন। চিঠিটির শিরোনাম ছিল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ কাকে বলে?' ৭ জানুয়ারি, ১৯৩১ নৈনি জেল থেকে জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরাকে লেখা চিঠির মতন এই চিঠি। ঠিক একই রকম পত্রালাপ চলেছিল সুখদেব এবং গান্ধীজীর মধ্যে, যা ৩০ এপ্রিল, ১৯৩১ হিন্দী 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা সকলেই জানি যে সশস্ত্র বিপ্লবে ভীত ব্রিটিশ সরকারকে আশ্বাস দিতে এবং জনতার আক্রোশ লিখিতভাবে লণ্ডনস্থিত সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৮৮৫ সালে ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্থাপনা হয়, যাতে এ. ও. হিউম প্রমুখের সহযোগিতা ছিল। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মামলার সময় তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার জন্য মোহম্মদ আলি জিন্না আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন, এ

কথা খুব কম লোকেই জানেন। ১৯১৬ সালে, যে সময়ে লখনউ-র কেসরবাগে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে, সেই একই সময়ে জিন্না মুসলিম লীগের অধিবেশনে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'যে আদর্শ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের, সেই একই আদর্শ ইণ্ডিয়ান মুসলিম লীগেরও। দেশের মঙ্গলের জন্য প্রতিটি কাজে এই দল সর্বদা কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে।' ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৯০৭ সালে দুই ভাগে ভাগ হল—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নরমপন্থীদের এবং লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক চরমপন্থীদের নেতা রূপে স্বীকৃত হলেন। একথা হয়ত কম লোকেই জানেন যে হিউম নানা প্রকার সামাজিক সংশোধন কার্যের জন্যেই কংগ্রেসের বিকাশ চেয়েছিলেন। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন এঁকে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এঁদের দুজনের, অর্থাৎ গোখলে ও তিলকের মৃত্যুর পর এই সংস্থার নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর হাতে চলে আসে। ১৯২০-র ডিসেম্বরে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়েছিল, যেখানে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন অনুমোদিত হয়। ব্রিটিশ সরকার সংশোধনের প্রস্তাব এনে জন-জাগৃতির এই সমস্যার সমাধান করতে চাইল। তাদের নীতি দমনের নীতি থেকে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের নীতি হয়ে উঠল। অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি করো ও শাসন করো। কংগ্রেসের গোলটেবিল যুগ শুরু হয়ে গেল। গান্ধীজীর স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। জেল উপছে পড়ল মানুষের ভীড়ে। নেতাদের শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া না হলেও মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া বজায় রইল। যেমন, বড় ভাই বিট্‌ঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর বল্লভভাই প্যাটেলকে মুক্তি দেওয়ার কথা না ভেবে তাঁর লিখিত আবেদনের জন্য অপেক্ষা করা। তবে রাজনৈতিক বন্দীদের দেখাসাক্ষাৎ করা এবং লেখাপড়া করার সুবিধে দেওয়া শুরু হল। জেলের মধ্যে অনেক সাহিত্যসৃষ্টি হল, যার বীজ লোকমান্য তিলক আগেই রোপন করেছিলেন। 'গীতারহস্যে' তিলক ফলের কামনা না করে কর্ম করে যাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। জওহরলাল নেহরু নিজের মেয়ে ইন্দিরাকে নিয়মিত চিঠি লিখেছেন, পরে যা 'বিশ্ব-ইতিহাসের ঝলক' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী শ্রীমতী ক্যুরীর ইংরাজিতে লেখা আত্মজীবনীর অনুবাদ করেছেন।

ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর আত্মকথায় কংগ্রেস আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস লিখেছেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশিত গান্ধীজীর 'জেলখানার অভিজ্ঞতা'য় সত্যাগ্রহীর আদর্শ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ছোট্ট এই বইটিতে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল নেতা ও বিপ্লবীর লেখা চিঠি ও রচনার সামান্য অংশও তুলে ধরা এক কঠিন প্রয়াস। সেই দীর্ঘ তালিকাকে স্থান করে দেওয়ার মতো পরিসর এখানে নেই। যদি আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের মনে তাদের অতীতের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা জাগাতে পারি তাহলেই আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করব।

দেবেশ চন্দ্র

জেলখানার অভিজ্ঞতা

কিছু ভয়ঙ্কর পরিণতি

এই অধ্যায়ে জেল কর্মচারীদের একটি বিশেষ ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। তাদের ধারণা যে তাদের কর্তব্য শুধু কয়েদীদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং কয়েদীরা যেন নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া না করে ও পালিয়ে না যায় এ বিষয়ে সতর্ক থাকা। আমার মতে জেলকে পশুশালা বললে অত্যুক্তি হবেনা। এই পশুশালার ব্যবস্থা ভালো মন্দ দু'রকমই হতে পারে। যে অধ্যক্ষ কয়েদীদের জন্য ভালো আহারের ব্যবস্থা করেন, বিনা কারণে তাদের শাস্তি না দেন, সরকার ও কয়েদীদের অভিমতে তিনিই আদর্শ অধ্যক্ষ। দুই পক্ষই এর অধিক কিছু প্রত্যাশা করেনা। যদি কোনো অধ্যক্ষ কয়েদীদের প্রতি ব্যবহারে মানবিকতার পরিচয় দেন, তাহলে সম্ভবত কয়েদীরাই তাঁকে ভুল বুঝবে, এবং সরকারও তাঁর কার্যকলাপ মন্দ না-হওয়া সত্ত্বেও, অস্বাভাবিক হওয়ার জন্যে তাঁকে অবিশ্বাস করবে।

অতএব কারাগার চারিত্রিক স্খলন এবং ক্রমবর্দ্ধমান দুর্নীতির আড্ডা হয়ে উঠেছে। এখানে থেকে কয়েদীরা সংশোধিত হয়না, তারা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। কারাগার এমন একটি সংস্থা যা জনতা দ্বারা সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত। এখানকার ব্যবস্থায় জনতার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর যদি থাকেও তা অতি সামান্য। যখন অল্পবিস্তর খ্যাতিপ্রাপ্ত কোনো রাজনৈতিক বন্দী কারাগারে আসেন, তখন জনতা প্রাচীরের ওপারে কী হচ্ছে তা জানার জন্যে উৎসুক হয়।

কয়েদীদের যে শ্রেণীবিভাগ তা-ও করা হয় কয়েদীদের হিতের চেয়ে বেশী প্রশাসনের হিতের কথা মনে রেখে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা দেখতে পাই একজন পাকা অপরাধীর সঙ্গে একই শ্রেণীতে, এমন কী একই কুঠুরীতে রাখা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে, যে কোনো অপরাধ করেনি, কেবল

সাধারণ কোনো আইন অমান্য করেছে মাত্র। বিভিন্ন প্রকারের চল্লিশ-পঞ্চাশজন অপরাধীকে কয়েকমাসের জন্যে একই কুঠুরিতে বন্ধ করে রাখা হয়,—একবার এই পরিস্থিতি কল্পনা করে দেখুন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যে ছাপ মারা টিকিট ব্যবহার করেছে বলে 'স্ট্যাম্প আইন' অমান্য করার অপরাধে দণ্ডিত, তাকে এমন একটি ব্লকে রাখা হয়েছিল, যেখানে নাম করা ভয়ানক সব দাগী অপরাধীদের রাখা হয়েছে। খুনী, ডাকাত, চোর এবং একজন সাধারণ আইন অমান্যকারীকে একই জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া নিত্যকার ঘটনা। এমন কিছু কিছু কাজ আছে যার জন্যে বেশ কয়েকজন লোকের দরকার হয়,— যেমন কুয়া থেকে জল টানা। এইসব কাজে শক্ত-সমর্থ লোকেদেরই ব্যবহার করা উচিত। একবার অত্যন্ত ভাবুক প্রকৃতির এক ব্যক্তিকে সেইরকম একটি দলে রাখা হল। সেই দলে অধিকাংশ ব্যক্তি অত্যন্ত অশিষ্ট ভাষায় কথা বলে, যে ভাষা কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কানে শোনাও সম্ভব নয়। যে সব লোকে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, তারা সেই ভাষাকে অশ্লীল মনে করে না। কিন্তু ভাবুক প্রকৃতির ব্যক্তিকে সেই ভাষা অত্যন্ত পীড়া দেয়। এই দলটি একজন ওয়ার্ডারের অধীনে ছিল, যে ওয়ার্ডার কাজ করানোর সময়ে কয়েদীদের অত্যন্ত বিশ্রী ভাষায় গালি দিত। বেশী রেগে গেলে সে ডাণ্ডা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করত না। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই দুটি কাজ করার কোনো অধিকারই তার ছিল না, উপরন্তু কাজ দুটি আইন-বহির্ভূত। আমি এইরকম আইন-বহির্ভূত কাজের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করতে পারি যা কারাগারের কর্মচারীদের জ্ঞাতসারে, আবার কখনো তাদের সংকেতেই হয়ে থাকে। আমি যে ভাবুক ব্যক্তিটির উল্লেখ করেছি, সে ঐ অশ্লীল ভাষা সহ্য করতে পারেনি; অতএব ঐ ভাষা প্রয়োগ বন্ধ না হলে সে ঐ দলের হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে। সেই সময়ে মেজর জোন্স হস্তক্ষেপ করায় পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব হয়। কিন্তু পরিবর্তন যে ক্ষণিকের হতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে না দেওয়ার ক্ষমতা মেজর জোন্সের ছিল না। কারণ যতক্ষণ না একটি নৈতিক মানদণ্ড অনুসারে কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে এবং প্রশাসনের সুবিধার চেয়ে মানবিক বোধকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনোই বন্ধ করা যাবে না।

আমার ধারণা ছিল কারাগারে, যেখানে কয়েদীরা দিনরাত কড়া পাহারায় থাকে, ওয়ার্ডারের দৃষ্টির বাইরে কখনোই যায়না, সেখানে অপরাধ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানে সবরকম নৈতিক অপরাধ হয়ে থাকে, এবং নির্ভয়েই হয়ে থাকে। ছোটখাট চুরি, ধাপ্পাবাজি, সাধারণ মারামারি এমন কী দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথাও বলছি না; কিন্তু একথা নিশ্চয়ই জানাতে চাই যে এখানে অপ্রাকৃতিক অপরাধ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমি এর বর্ণনা করে পাঠককে পীড়া দিতে চাই না। কারাবাসের বহু অভিজ্ঞতা সত্বেও আমার ধারণা ছিল না যে কারাগারে এই ধরনের অপরাধও হয়ে থাকে। কিন্তু এই অর্বদা জেলে একাধিকবার এই ধরনের ঘটনার কথা জেনে দুঃখবোধ করেছি। অপ্রাকৃতিক অপরাধ এখানে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে এই কথা জেনে সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছি। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় যাঁরা আমাকে এই বিষয়ে বলেছিলেন, তাঁরা সকলেই মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অপরাধ দূরীকরণ অসম্ভব। যে ব্যক্তি এই অপরাধের শিকার হয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারে তার কোনো সম্মতি থাকে না। আমি বহু চিন্তার পরেই বলছি এই অপরাধ দূরীকরণ সম্ভব, শুধুমাত্র যদি কারাগারের প্রশাসনে মানবিকতার প্রকাশ হয়, আর যদি তাকে সর্বসাধারণের চিন্তার বিষয় করে তোলা যায়। ভারতবর্ষের জেলে কয়েদীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ। প্রশাসনের অধিকর্তাদের একথা ভেবে দেখা উচিত যে কত সহ্য করছে এরা। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হল সংশোধন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য যে মন্ত্রীসভা, বিচারপতি, এবং জেল-কর্মচারী সকলেই আশা করেন যে শাস্তির দ্বারা অপরাধের প্রবৃত্তি দূর হবে; শুধু শরীর ও মনের কষ্টের জন্যে নয় বরং অনুতাপের ফলে হবে, যা দীর্ঘকাল একান্ত বাসে হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সত্য এই যে শাস্তি কয়েদীকে আরো পশুতুল্য করে দেয়। কারাগারে সে অনুতপ্ত বা সংশোধিত হওয়ার অবকাশ পায় না। সহৃদয়তার সেখানে বড় অভাব। এ কথা ঠিকই যে প্রতি সপ্তাহে সেখানে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হয়। আমাকে কখনোই এই সভাগুলিতে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমি জানি এগুলি কত অন্তঃসারশূন্য। এ কথা বলছি না যে ধর্মোপদেষ্টারা ভণ্ড, কিন্তু সপ্তাহে একবার খানিকক্ষণ ধর্মচর্চার কোনো প্রভাবই তাদের উপর পড়ে না, যারা অপরাধ করাকে মন্দ কাজ বলে মনেই করে না। সহানুভূতিপূর্ণ একটি

পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে কয়েদীরা নিজের অজান্তেই তাদের কু-অভ্যাসগুলি ত্যাগ করে শিষ্ট ব্যবহার শিখবে।

যতদিন কয়েদীদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করার প্রথা অব্যাহত থাকবে, ততদিন এই পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে মন্দ দিক হল কয়েদীদের কর্তা হিসেবে নিয়োগ করা। দীর্ঘ সাজা পাওয়া কয়েদীরাই এই সব পদে বহাল হয়। অতএব এরা সকলে এমন লোক হয় যারা মারাত্মক কোনো অপরাধ করে শাস্তি পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রুর স্বভাবের কয়েদীদের ওয়ার্ডার করা হয়। এরা অত্যন্ত উদ্ধত হয়, আর আগ বাড়িয়ে কাজ হাসিল করতে সক্ষম। জেলখানায় যত অপরাধ হয়, তার অধিকাংশেই এদের হাত থাকে। এইরকম দুটি ওয়ার্ডারের মধ্যে একবার সকলের সামনেই লড়াই হয়, যার মধ্যে একজন মারা যায়। লড়াই-এর কারণ একজন কয়েদী, যে তাদের দুজনেরই অপ্রাকৃতিক কামবাসনার শিকার ছিল। সকলেই জানত জেলের ভেতরে কী ঘটে চলেছে, কিন্তু কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র এইটুকু ছিল যাতে লড়াই ও হত্যাকাণ্ড না ঘটে। এই কয়েদী-ওয়ার্ডাররাই স্থির করে অন্য কয়েদীদের কোন কাজে লাগানো হবে। তাদের কাজের দেখাশোনাও এরাই করে। অধীনস্ত কয়েদীদের স্বভাবের জন্যেও এরা দায়ী হয়। প্রকৃতপক্ষে জেল অধ্যক্ষ যা কিছু বলতে ও করতে চান তা এই কয়েদীদের দিয়ে বলানো ও করানো হয়, অর্থাৎ এদের উপরেই অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। আমি এটা ভেবে আশ্চর্য হই যে এই ব্যবস্থায় অবস্থার যত অবনতি হয়েছে, তার চেয়ে আরো বেশী হল না কেন? তারপর মনে এই সত্য উপলব্ধি করি যে মানুষের মান সর্বদাই একটি দূষিত সমাজ-ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত, এবং একটি উৎকৃষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়। মনে হয় মানুষের স্বভাব সর্বদাই একটি মধ্যম স্তর অবলম্বন করতে চায়।

রান্নাঘরের সমস্ত দায়িত্ব কয়েদীদের। ফলে, প্রথমত, রান্না অতি অযত্নে করা হয়, আর দ্বিতীয়ত, অতি স্পষ্টভাবে পক্ষপাত করা হয়। কয়েদীরাই আটা মাখে, শাক-সবজি কাটে, রান্না করে এবং পরিবেশন করে। রান্না যখনই খারাপ হয়, তার জন্যে নালিশ করা হলে একটিই উত্তর শুনতে পাওয়া যায়—এর প্রতিকার কয়েদীরাই করতে পারে, কারণ নিজেদের রান্না

তারা নিজেরাই তো করে; যেন তারা সকলে একে অন্যের আপনজন এবং পারস্পরিক দায়িত্ব বোঝার ক্ষমতা রাখে। আমি একবার তর্কের দ্বারা এই ব্যাপারে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছিলাম, তখন আমাকে বলা হল যে কোনো শাসন ব্যবস্থা এত ব্যয়ভার বহন করতে চায়না। আমার কথাটা ঠিক মনে হয়নি, পরে এই বিষয় নিয়ে আরো চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে যদি বিধিবদ্ধভাবে কাজ করা যায় তাহলে কারাগারের প্রশাসনকে আত্মনির্ভর করে তোলা যেতে পারে। অন্য একটি অধ্যায়ে কারাগারের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করার কথা চিন্তা করছি। এখন আমাকে এই কথা ভেবেই সন্তুষ্ট হতে হবে যে নৈতিক দুরাচারের বিষয়ে চিন্তা করার কালে খরচের প্রশ্ন না ওঠাই ভালো।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১-৫-১৯২৪

রাজনৈতিক বন্দী

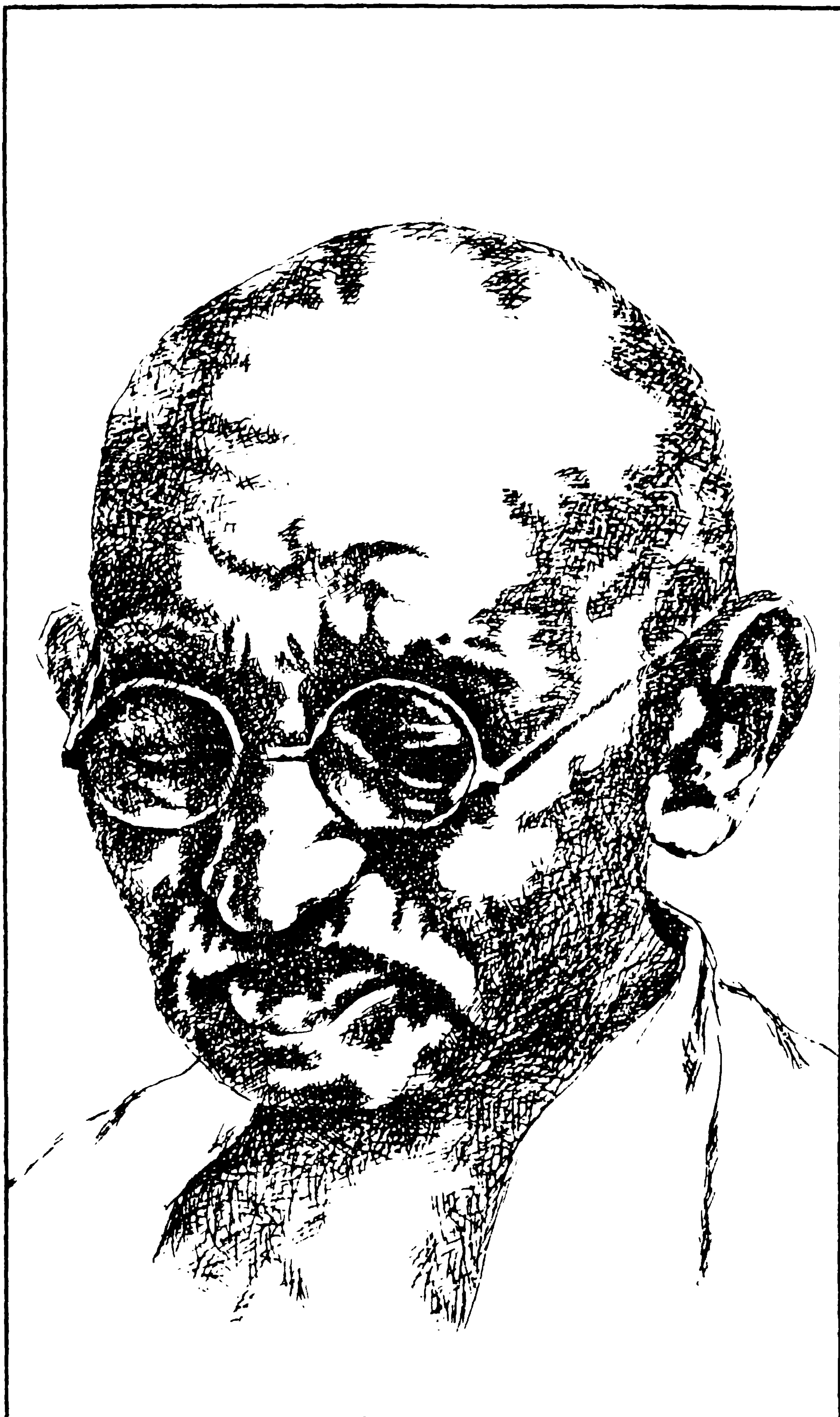
'আমরা রাজনৈতিক ও অন্য বন্দীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আপনার জন্যে কোনো বিভেদ করা হোক আপনি নিশ্চয়ই তা চাইবেন না।' গত বছর স্যর জর্জ লয়েড যখন অর্বদা জেলে এসেছিলেন, তখন এই কথাই বলেছিলেন। আমার মুখ থেকে অসাবধানে 'রাজনৈতিক' বিশেষণটি বেরিয়ে আসে, তার উত্তরেই তিনি এই কথা বলেছিলেন। আমার আরো বেশী সতর্ক থাকা উচিত ছিল, কারণ আমি জানতাম গভর্ণর মহোদয় এই শব্দটি পছন্দ করেন না। অথচ আশ্চর্যের কথা, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদীর দৈনিক ব্যবহারের টিকিটে 'রাজনৈতিক' শব্দটি লেখা রয়েছে। যখন আমি এই অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করলাম, তখন জেল সুপারিনটেনডেন্ট জানালেন যে এটি একটি ঘরোয়া ব্যাপার, শুধুমাত্র জেল-কর্মচারীদের সুবিধার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কয়েদীদের এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কারণ এই প্রভেদ তাদের কোনো বিশেষ দাবী জানানোর অধিকার দেয় না।

স্যর জর্জ লয়েডের কথাগুলি আমি আমার স্মৃতি থেকে যথাযথ উদ্ধৃত করেছি। স্যর জর্জ যা বলেছিলেন তাতে একটি অহেতুক আক্রমণ ছিল।

উনি জানতেন আমি কোনো পক্ষপাত বা বিশেষ ধরনের ব্যবহারের প্রত্যাশা করিনা। কথা প্রসঙ্গে এই শব্দটি উচ্চারণ করেছি মাত্র। কিন্তু উনি আমাকে জানাতে চাইলেন আইনের এবং প্রশাসনের দৃষ্টিতে আমার স্থান কোনো ভাবেই অন্যদের চেয়ে আলাদা নয়। অকারণেই সিদ্ধান্তের নামে এই বিভেদের প্রতিবাদ করা আবার অন্যদিকে তাকে ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ করা এক শোচনীয় অসঙ্গতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিভেদ রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধেই করা হয়।

সত্যি কথা হল এই বিভেদ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। যদি এই কথা মনে রাখা হয় যে সব কয়েদীই মানুষ, তাহলে তাদের জীবন-যাত্রার ধারাকে বোঝা ও সেই অনুসারে জেলে তাদের ব্যবস্থা করা জরুরী হয়ে পড়ে। এখানে প্রশ্ন গরীব-বড়লোক বা শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে প্রভেদ করা নয়, তাদের জীবন-ধারণ পদ্ধতি অনুসারে বিভেদ করা, যে পদ্ধতিতে তারা চিরকাল অভ্যস্ত। এই বাস্তব পরিস্থিতি অনিবার্য ভাবে মেনে না নিয়ে এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে আইন কাউকে রেহাই দেয় না; কোনো ধনী ব্যক্তি বা কোনো শিক্ষিত অথবা মজুর যে কেউ চুরি করুক না কেন, আইনের চোখে সবাই সমান। একটি নির্দোষ ও ভালো আইনের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। যদি আইনের চোখে সবাই সমান হয়,—যেমন হওয়া উচিত, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার সহ্যশক্তি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। যে চোরের স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল তাকে তিরিশ ঘা চাবুক মারা ও যার শরীর হৃষ্টপুষ্ট তাকেও তিরিশ ঘা মারা নিরপেক্ষ ব্যবহার মনে করা যায় না। এমন করা হলে দুর্বল স্বাস্থ্যের লোকটির প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিটিকে অনুগ্রহ করা হবে। ঠিক সেই রকমই শ্রদ্ধেয় মোতিলাল নেহরুকে শক্ত মেঝের উপর, নারকোল ছোবড়ার কর্কশ চাটাইতে শুতে দেওয়া সম-ব্যবহার করা নয়; অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার উদাহরণ হবে।

যদি একথা স্বীকার করা হয় যে কয়েদীরাও মানুষ, তাহলে জেলে প্রবেশ করার প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্ন হবে। আঙুলের ছাপ নিশ্চয়ই নেওয়া হবে; রেজিস্টারে অপরাধের তালিকাও লেখা হবে; কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যক্তিটি প্রত্যহ যে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত তার বিবরণও লেখা থাকবে। অধ্যক্ষ যদি কয়েদীদের মানুষ মনে করেন তাহলে উনি যে পদ্ধতি গ্রহণ করবেন তাকে



মহাত্মা গান্ধী

'বিভেদ করা' না-বলে 'শ্রেণী-বিভাগ' বলা হবে। একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ তো আজও করা হয়। উদাহরণত, কিছু সংখ্যক কয়েদীকে লম্বা একটি ঘরে একত্রে রাখা হয়। বিপজ্জনক কয়েদীদের জন্যে আলাদা কুঠুরি থাকে, আর একান্তবাসের শাস্তি পাওয়া কয়েদীকে তালা বন্ধ ঘরে আলাদা রাখা হয়। এছাড়া ফাঁসীর কুঠুরিও থাকে, যেখানে ফাঁসীর আসামীকে রাখা হয় এবং পরিশেষে হাজতের কয়েদীদের জন্যে আলাদা ফাটকের ব্যবস্থা থাকে। পাঠক জেনে আশ্চর্য হবেন যে বেশীরভাগ রাজনৈতিক বন্দীকে আলাদা বা একান্তে রাখা হয়। কয়েকজনকে তো ফাঁসীর আসামীর জন্যে নির্দ্ধারিত কুঠুরিতেও রাখা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই যেটা না বললে জেল-কর্তৃপক্ষের প্রতি অন্যায় করা হবে। কথাটা হল, যাদের কারাগার বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই তারা মনে করতে পারে যে ফাঁসীর আসামীকে খুব খারাপ অবস্থায় রাখা হয়, তা কিন্তু সত্যি নয়। অন্ততপক্ষে অর্বদা জেলে এই ঘরগুলি বেশ বড় ও আলো হাওয়া যুক্ত। আমার যে বিষয়ে আপত্তি তা হল এর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ।

আমি আগেই বলেছি শ্রেণীবিভাগের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, এবং তা করাও অসম্ভব নয়। সেই শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানভিত্তিক ও মানবিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি জানি, আমি যে ভাবে চাই সেইভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে গেলে বর্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সেটা অবশ্যই ব্যয় সাপেক্ষ। নতুন পদ্ধতির জন্যে অন্য ধরনের লোকেরও দরকার হবে। হয়ত তার জন্যে আজ বেশী খরচ হবে, কিন্তু পরিশেষে সঞ্চয়ও হবে। আমি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবছি তাতে সবচেয়ে বড় লাভ যা হবে তা হল—অপরাধীর সংখ্যা নিশ্চিত রূপে কমে যাবে এবং কয়েদীদের সংশোধন হবে। জেল একটি সংশোধন-গৃহে রূপান্তরিত হবে, যেখানে অপরাধীরা সংশোধিত হয়ে আবার সমাজে ফিরে এসে সেখানকার প্রতিষ্ঠিত সদস্য পদ গ্রহণ করবে। হয়ত সেদিন বহু দূরে; কিন্তু আমরা যদি পুরনো প্রথার মোহ ত্যাগ করি, তাহলে জেলকে সংশোধন গৃহে রূপান্তরিত করা কঠিন হবে না।

একজন জেলরের একটি সারগর্ভ উক্তি মনে পড়ছে উনি বলেছিলেন : 'আমি যখন কয়েদীদের ভর্তি করি, তাদের তল্লাশী নিই বা তাদের বিষয়ে রিপোর্ট করি, তখন আমার মনে একটি প্রশ্ন ওঠে,—আমি কী

এই লোকগুলির চেয়ে বেশী ভালো? ঈশ্বর জানেন, এরা যেসব অপরাধের জন্যে এখানে এসেছে, তার চেয়ে হীন অপরাধ আমি নিজে করেছি। তফাৎ এই যে এদের অপরাধের কথা সকলে জেনেছে আর আমার অপরাধের কথা কেউ জানে না।'

যেকথা এই সহৃদয় জেলরটি স্বীকার করেছেন, তা কী আমাদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়? সমাজ তো তাদের দিকে আঙুল তোলে না। যেসব লোকে ধরা না পড়ার চাতুরি শেখেনি, আমরা শুধু তাদের প্রতি নির্দয় হই। কারাবাসের পরিণাম স্বরূপ অধিকাংশ সময়ে তারা পাকা অপরাধী হয়ে যায়।

একজন গ্রেপ্তার হলেই তার সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ অপরাধী সিদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে নির্দোষ মনে করা উচিত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এদের অপমানিত ও তিরস্কৃত করেন। যে ব্যক্তিকে অপরাধী চিহ্নিত করা হয় সমাজও তাকে ত্যাগ করে। জেলের পরিবেশ তার মধ্যে হীনমন্যতার ভাব এনে দেয়।

এই পরিবেশের কু-প্রভাব রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। মনকে ক্ষুদ্র করে দেওয়া এই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এবং আংশিকভাবে তার সংশোধন করতেও সক্ষম হয়। সমাজ তাদের অপরাধী ভাবে না, বরং তাদের বীরপুরুষ ও শহীদ মনে করা হয়। জেলে তারা যে কষ্ট পায়, অনেক বেশী বর্দ্ধিত আকারে তার প্রচার হয়। অনেক সময়ে এই অতি প্রশংসা রাজনৈতিক বন্দীদের পতনের কারণ হয়। দুর্ভাগ্য এই যে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জনতা যত উদার, জেল-কর্মচারীরা ততই কঠোর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কঠোরতা অকারণেই হয়ে থাকে। সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ কয়েদীর চেয়ে বেশী বিপজ্জনক মনে করে। একজন জেলর অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বলেছিলেন যে রাজনৈতিক অপরাধী সম্পূর্ণ সমাজের পক্ষেই অনিষ্টকারী আর সাধারণ অপরাধী শুধু নিজের ক্ষতি করে।

অন্য একজন জেলর আমাকে বলেছিলেন যে রাজনৈতিক বন্দীদের আলাদা রাখা, তাদের পত্র-পত্রিকা পড়তে না দেওয়ার কারণ তারা যেন নিজেদের অপরাধ উপলব্ধি করতে পারে। তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক

বন্দীরা তাদের বন্দী দশাতেও গর্ব অনুভব করে। স্বাধীনতা খর্ব হওয়ায় সাধারণ অপরাধী দুঃখিত হয়। রাজনৈতিক অপরাধীর মধ্যে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। তিনি আরো বলেছিলেন যে এই কারণেই সরকারের পক্ষে এটা স্বাভাবিক যে তাদের শাস্তি দেওয়ার অন্য কোনো উপায় খোঁজা। এই কারণে সাধারণত যে সব সুযোগ সুবিধা কয়েদীরা পেয়ে থাকে, রাজনৈতিক বন্দীরা তা থেকে বঞ্চিত হন। আমি সাপ্তাহিক 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া', 'মডার্ন রিভিউ' অথবা 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকা চেয়েছিলাম, তার উত্তরে জেলর এই কথাগুলি বলেছিলেন। যারা খবরের কাগজ পড়াকে প্রাতরাশের মতো জরুরী মনে করে, তাদের কাছে এটা খুব কঠিন শাস্তি। পাঠক একে কোনো মামুলী শাস্তি মনে করবেন না। আমার ধারণা মজিলকে যদি সংবাদ পত্র পড়তে দেওয়া হত, তাহলে হয়ত তিনি অপ্রকৃতিস্থ হতেন না। এটা খুব উদ্বেগের ব্যাপার যে যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে তাকে সংশোধন করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে তাকে ওরা ভয়ানক সব অপরাধীর সঙ্গে রেখে দেয়। অর্বদা জেলে প্রায় সব রাজনৈতিক বন্দীকে সেই ভাবেই রাখা হয়। যে সব লোক গালি দেওয়া ছাড়া কথা বলে না, যাদের কথাবার্তা অমার্জিত, তাদের সঙ্গে একত্রে বাস করা সহজ কাজ নয়। যদি সরকার সাধারণ কয়েদীদের প্রভাবিত করার একটি উপায় হিসেবে, রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাদের এই পরিবেশে রাখতেন, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আমি বলতে চাইছি যে রাজনৈতিক বন্দীদের অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্যেই তাদের এই অরুচিকর পরিবেশে রাখা হয়; যে শাস্তি আদৌ তাদের প্রাপ্য নয়। এই বন্দীদের একান্তে রাখা উচিত, আর তারা যে পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত তা জেনে সেই অনুসারে তাদের প্রতি ব্যবহার করা উচিত।

জেলের বর্তমান অবস্থার সংশোধনের জন্যে আমার এই প্রচেষ্টার কোনো বিপরীত অর্থ করবেন না। যত অসুবিধার সম্মুখীন হতে-হোক না কেন, ক্রুদ্ধ হওয়া সত্যাগ্রহীর শোভা পায় না। সে নির্দয়তম ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এখানে এসেছে, তার সঙ্গে যদি ভালো ব্যবহার করা হয় তো ভালো; যদি না করা হয় তা-ও ভালো।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৮-৫-১৯২৪

বল্লভভাই প্যাটেল

তিনটি চিঠি

এক

অর্বদা মন্দির

৫-৬-১৯৩৩

পুজনীয় বাপু,

প্রায় একমাস পরে আপনার হাতের লেখা দেখতে পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা দুজনে ভালো আছি। আমি কী আর চিন্তা করব, আর আমার চিন্তা কোন কাজেই-বা লাগবে? আপনার চিন্তার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর আছেন। নিজ হাতে চিঠি লেখার তাড়া করবেন না। আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন। ততদিন মহাদেবকে দিয়েই চিঠি লেখাবেন, আপনি শুধু সাক্ষর করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

আশ্রম সম্বন্ধে আপনি যা জানতে চান তা জানার জন্য নারদ দাসকে ডেকে নেবেন। আপনি ওখানে যাওয়ার কথা চিন্তাও করবেন না। আমার মনে হয় নারদ দাস নিজের সঙ্গে যাকে আনতে চায় নিয়ে আসুক, আপনাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যেন আগ্রহী না হয়। আশ্রমের যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তা যমুনালাল জীকে পাঠিয়েও করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই সময়ে এই কাজের জন্যে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া একেবারেই উচিত হবে না। দলে দলে লোক জুটবে সেখানে। তারা আপনার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে চাইবে, আপনার একটুও বিশ্রাম হবে না। নারদ দাসের এইসব বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই, কারণ ঐ চিত্রটি তার সামনে ধরা পড়ে না। সেই কারণে সে আপনাকে ডাকছে। কিন্তু যদি সে পরিস্থিতি সত্যই বুঝতে পারে, তাহলে কখনোই ডাকবে না।

আমার জন্যে আম পাঠিয়েছেন কেন? আজ আপনি ভালোবাসছেন, কিন্তু কাল কী করবেন কে জানে! আপনার দয়া আর অহিংসার মধ্যেও

নির্দয়তা ও হিংসা ভরা আছে তাকে 'যে রামের তীর খেয়েছে সেই জানে।' আমার কথা যদি না মানেন, তাহলে 'বা'কে জিজ্ঞেস করে নেবেন। তিনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহমত হবেন।

শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন। রামদাসকে দেখবেন। তার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। ছগনলাল (জোশী) আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

বল্লভভাই-এর সাদর দণ্ডবৎ প্রণাম

মহাত্মা গান্ধী সমীপে
পুণা

দুই

সেন্ট্রাল প্রিজন, নাসিক রোড
১-২-১৯৩৪

প্রিয় স্বামী আনন্দ,

তোমাকে তো হঠাৎ পালাতে হল। ডাহ্যাভাই দেখা করতে আসায় জানতে পারলাম।

ওখানকার খবর জানবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি। বিহারের খবর জানার পর এই দু বছরে প্রথম বার জেলখানা বড় কঠোর মনে হল। সেই দিন থেকে বড় অশান্তিতে রয়েছি। কাজ হচ্ছে, পয়সা আসছে কিন্তু আমার মন কিছুতেই মানছে না। আবার আমাদের ভালকরে খুঁটি শক্ত করার সুযোগ এসেছিল। আমার শুধু মনে হচ্ছে নিজেকে যতটা কাজে লাগাতে পারতাম, ততটা লাগাতে পারলাম না। আমি কী করব? অসহায়ের মতো পড়ে আছি। বেচারী রাজেন্দ্রবাবু! তিনি এমন যে কোনো লোক মরছে দেখেও তাকে 'মর' বলতে পারেন না। অতি সজ্জন ও বিনয়ী লোক। কিন্তু কর্ম্ম-কুশলতা কম। বাপু নিজে আপনাদের সকলকে পাঠিয়েছেন। জওহরও সেখানে গিয়ে পৌঁচেছে। তবু তেমন হৈ চৈ হল না কেন, যাতে সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়? সব কিছু এক পাশে ঠেলে বিহারেই সর্ব শক্তি নিয়োগ করা উচিত ছিল। শুধু বাপুকে যদি নিজের পথে চলার অনুমতি দেওয়া

হত, তাহলে সব কিছু এক পাশে ঠেলে, এক কথা, এক কাজের ধূম পড়ে যেত। অনেক কিছু হতে পারত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, 'প্রভু ছাড়া বিপদভঞ্জন আর কে আছেন?' কী করব? অসহায়ের মত পড়ে আছি।

সময় পেলেই তোমার মতামত আর কাজের বিষয়ে লিখো। জানার ইচ্ছা রইল। সরকারের কাজ তো ছ্যাকরা গাড়ির মতো চলে। এখন পর্যন্ত লোকেরা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া মৃতদেহগুলোও বার করতে পারেনি।

ওখানে কোথায় রয়েছ? আর কে কে আছেন? এই সব কথা ছাড়াও সাধারণ লোকে কোন কোন কাজে হাত লাগিয়েছে সে বিষয়ে জানিও।

রাজেন্দ্রবাবুর খবর কী? তাঁর শরীর কেমন আছে? প্রফেসরও (আচার্য কৃপালনী) ওখানে গিয়ে পৌঁচেছেন। উনি কী কাজ করছেন? তাঁকে বোলো আমাকে তাঁর খবর জানাতে। বন্যার দিনের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু সে ছিল ছোট খেলা। এখন তো সমুদ্র মন্থনের কাজ করতে হবে।

বাবু ৯ তারিখে বেলগাঁও যাবে। সে মহাদেব ও মণির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়েছে।

বল্লভভাই-এর বন্দেমাতরম

স্বামী আনন্দ সমীপে
ক্যাম্প : পাটনা

তিন

অর্বদা মন্দির
১৮-১২-১৯৪০

প্রিয় ভাই মহাদেব,

আজ একমাস পুরো হল। তুমি ঠিক একমাস আগে দেখা করে গিয়েছিলে। বুঝতে পারছি না সাবরমতী থেকে লেখা আমার চিঠিটা পেয়েছ কী-না। ...আগে তো চিঠি পেতে অনেক ঝামেলা হত। এখন অবস্থা কিছু পাল্টেছে। এখনও ডি.আই.জি., সি.আই.ডি.র মারফৎ আমাদের চিঠি আসে। এইজন্যে দেরী হয়। আশাকরি কিছুদিন পরে সুব্যবস্থা হবে।

সেই ঐতিহাসিক গাছটির নীচে, যেখানে বাপুর খাটিয়া পাতা হত, সেখানে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকি। শুয়ে শুয়ে রাত্রির আকাশের তারা দেখি। যেখানে বাপু 'অর্বদা মন্দির' বানিয়েছিলেন, যেখানে অনশন করেছিলেন, যেখানে বসে 'পুণা-প্যাক্ট' সই করেছিলেন, সেখানেই পড়ে আছি। বাপুর স্নানের জন্যে যে ঘরটি ছিল, সেই ঘরটি আমি নিয়েছি। স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে আবার এই পুণ্যভূমিতে এসে থাকতে হবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অটল। এইখানেই আমরা দিনরাত একসঙ্গে থেকেছি। পুরোনো দিনের ছবিগুলি বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এবারের দলটি একটু অন্যরকম। সেই জন্যে মনে হয় যে সেই রসের আস্বাদ যে পেয়েছে, সেই তা বোঝে। তবু তুলসীদাসের একটি উক্তি মনে করে কাজ চালাচ্ছি, 'তুলসী, এই সংসারে বিভিন্ন প্রকারের লোক, নৌকা ও নদীর সংযোগের মতো সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলো।'

এখানে বালাসাহেব, মঙ্গলদাস ও আমি, তিনজনে মিলে নিয়মিত চরখা কাটার ক্লাব খুলেছি। কিন্তু আগের বারে যত সূতো কেটেছি, এখন আর তত কাটতে পারি না। শরীর আর কাজ করতে চায় না। এখানে সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা দেখাশোনা করি। আমরা আটজন একসঙ্গে রয়েছি। এরমধ্যে ছ'জন বোম্বাই-এর ভূতপূর্ব মন্ত্রী, একজন কাউন্সিলের অধ্যক্ষ, আরেকজন বিধানসভার বিরোধীপক্ষের নেতা (ভুলাভাই দেশাই)। এতজন একসঙ্গে রয়েছি, অর্থাৎ পৃথিবী ঠিকঠাক চলছে।

ঈশ্বরের কৃপায় সকলের শরীর ভালো আছে।

বল্লভভাই-এর বন্দেমাতরম

শ্রী মহাদেব দেশাই সমীপে

লখনউ জেল

১৯২১ সালে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক্ অপরাধের জন্যে জেলে যাওয়া কোনো নতুন ঘটনা ছিল না। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে সেইসব লোকেদের লাইন লেগে গেছে, যারা দীর্ঘকালের সাজা নিয়ে জেলে এসেছে। মোকদ্দমা ছাড়া নজরবন্দীরাও ছিল। লোকমান্য তিলক, যিনি তাঁর যৌবনকালে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন, শেষ বয়সে ছ' বছরের সাজা পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জেলে পাঠানো ও নজরবন্দী রাখার ঘটনা আরো বাড়ল। অনেক ষড়যন্ত্রের মামলাও চলতে লাগল, যাতে সাধারণত মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হত। আলি-বন্ধু এবং মৌলানা আবুলকলাম্ আজাদও যুদ্ধের সময়ে নজরবন্দী হয়েছিলেন। যুদ্ধের ঠিক পরেই পাঞ্জাবে মিলিটারি আইন চালু হল, দলে দলে লোক জেলে গেল, ষড়যন্ত্র ও ছোটখাট মামলায় অনেকের জেল হল। এইভাবে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শাস্তি দেওয়া খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ জেনেশুনে জেলে যেতনা। মানুষ তার কাজ করে যেত, আর সেই কারণে রাজনৈতিক শাস্তি পেত, কিংবা হয়ত গোয়েন্দা পুলিশ তাদের অপছন্দ করত বলেই তারা শাস্তি পেত,—যে কারণেই শাস্তি পাক আদালতে তদ্বির-তদারক করে তারা নিজেদের বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করত। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে গান্ধীজী ও তাঁর অগণিত অনুগামী এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু তবু ১৯২১ সালে জেল একটি অজ্ঞাত স্থান ছিল, আর খুব কম লোকই জানত যে শাস্তি পাওয়া লোকগুলি জেলের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর ঐ ভয়াবহ ফটকের ওপারে কী হয়। আমরা মনে করতাম জেলের ভেতরে ভীতিকর জীবেরা বাস করে, যাদের পক্ষে যে কোনো হীন কাজ করাই অসম্ভব নয়। আমাদের ধারণা ছিল জেল নিঃসঙ্গতা, অপমান আর কষ্টের স্থান। সবচেয়ে বড় কথা সেই অজানা স্থান বিষয়ে একটি ভীতি

সর্বদাই থেকে যেত। ১৯২০ সাল থেকে বার বার জেল যাওয়ার কথা শুনে, আর বেশ কিছু সঙ্গীর জেল হওয়ায়, আমরা ক্রমশঃ জেল বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। তার বিষয়ে যে ভয় ও অপছন্দের ভাবনা আমাদের মনে নিজ হতে জন্ম নিত, তার তীব্রতাও কমে এল। কিন্তু আগে থেকে যতই মানসিক প্রস্তুতি হয়ে থাক না কেন, যখন লোহার ফটকের ভেতরে প্রথম বার প্রবেশ করলাম, তখন মনে ক্ষোভ ও উদ্বেগ অনুভব না করে পারলাম না। সেই সময়, অর্থাৎ তেরো বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কম করে তিন লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ রাজনৈতিক অপরাধ করে ঐ ফটকের ভেতরে প্রবেশ করেছে, যদিও এদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধেই ফৌজদারী আইনের অন্য কোনো ধারার অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েক হাজার লোক বার বার ভেতরে ঢুকেছে আর বাইরে এসেছে। তারা ভালো করেই জানত যে ভেতরে তারা কিসের প্রত্যাশা করতে পারে। এক ব্যক্তি যতদূর সম্ভব বিচিত্ররূপে অস্বাভাবিক, নীরস নির্লিপ্তির সঙ্গে কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং এক ভয়াবহ জীবন ধারণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, ততখানিই সে এই অদ্ভুত জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করে গেছে। আমরা এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাই, কারণ মানুষ সব কিছুতে অভ্যস্ত হতে পারে। তবু যখন আবার নতুন করে আমরা এই ফটকের ভেতরে প্রবেশ করি, তখন মনে সেই পুরোনো ক্ষোভ আর উদ্বেগের ভাব ফিরে আসে, মন অশান্ত হয় আর চোখ বার বার বাইরের সবুজ খোলা মাঠ, লোকজনের হাঁটা-চলা, গাড়ির ছুটে যাওয়া ও চেনা পরিচিত মুখগুলির দিকে (যাদের সঙ্গে আবার অনেকদিন দেখা হবে না) শেষবারের মতো ফিরে তাকায়।

আমার কারাবাস তিন মাস পরে হঠাৎ শেষ হয়েছিল; কিন্তু কারাবাসের প্রথম দিনটি জেল-কর্মচারী ও আমার দুজনের পক্ষেই ক্ষোভ ও অশান্তির দিন ছিল। জেলের অফিসার এই নতুন প্রকারের অপরাধীদের আগমনে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এই নতুন লোকগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যা দিনের পর দিন আরো বেড়ে যাচ্ছিল, কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। এ যেন এক বন্যার মতো প্রচলিত পুরোনো সীমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশী চিন্তার বিষয় আর কী হতে পারে যে এই নতুন লোকগুলি সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। এরা নানান শ্রেণী থেকেই এসেছে, সবচেয়ে বেশী

সংখ্যায় মধ্যম শ্রেণী থেকে। তবে এই নানান স্তরের মানুষের মধ্যে একটা বিষয়ে মিল ছিল। তারা সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের ছিল, তাদের সঙ্গে প্রচলিত ধারায় ব্যবহার করা চলত না। জেল-কর্মচারীরা এই ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, কিন্তু ব্যবহারের প্রচলিত ধারা ছাড়া অন্য কোনো ধারা তারা জানত না; তাদের সামনে কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না, কোনো অভিজ্ঞতাও নয়। সাধারণ কংগ্রেসী কয়েদীদের দমন করা শক্ত ছিল, তারা খুব নরম প্রকৃতির ছিল না। কারাগারের ভেতরে থাকলেও, দলে ভারী হওয়ার কারণে তারা সর্বদাই নিজেদের শক্তিশালী মনে করত। বাইরের আন্দোলন আর জেলখানার ভেতরের ব্যাপারে জনতার নতুন আগ্রহ তাদের মনোভাবকে দৃঢ় করেছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা সাধারণত জেল-কর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। আমরা যদি তাদের সাহায্য না করতাম তাহলে তারা সত্যিই খুব বিপদে পড়তেন। জেলর প্রায়ই আমাদের কাছে আসতেন, এবং অন্য ব্যারাকে আমাদেরই কোনো স্বেচ্ছাসেবককে শান্ত করাতে কিংবা কোনো ব্যাপারে তাকে রাজী করাতে অনুরোধ করতেন।

আমরা নিজের ইচ্ছায় কারাগারে এসেছিলাম। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তো জোর করে ভেতরে ঢুকেছিল, কাজেই কারুর পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না। কেউ যদি বেরিয়ে আসতে চাইত তাহলে স্বীয় কর্মের জন্য অনুশোচনা জানিয়ে, এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারত। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুর্নাম হত, আর এমন কাজ করা সত্যাগ্রহের মতো রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সমান। আমাদের লখনউ জেলের সুপারিনটেনডেন্ট এ ব্যাপারটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জেলর খানসাহেবকে বলতেন, "আপনি যদি কয়েকজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে পালিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে 'খানবাহাদুর' করে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করব।"

আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ কয়েদীকে জেলের ভেতরকার চত্বরে বড় বড় ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। আর আমাদের মধ্যে আঠারোজনকে, খুব সম্ভবত ভালো স্বভাবের জন্য বেছে নিয়ে একটি পুরোনো তাঁত-ঘরে রাখা হয়েছিল। তাঁত-ঘরটির সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা ছিল। আমার

বাবা, দুই খুড়তুতো ভাই ও আমার জন্য একটি আলাদা ঘর ছিল, লম্বা-চওড়ায় তা প্রায় কুড়ি ফুট বাই ষোলো ফুট। এক ব্যারাক থেকে অন্য ব্যারাকে যাওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল আমাদের। বাইরের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করাতেও কোনো বাধা ছিল না। খবরের কাগজ আসত। নতুন গ্রেপ্তারের খবর, আমাদের লড়াইয়ের নিত্য-নতুন ঘটনার খবরে পরিবেশ সরগরম হয়ে থাকত। নিজেদের মধ্যে আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কে অনেকটা সময় কেটে যেত, পড়াশোনা বা অন্য কোনো কাজই করা হত না। আমি নিজেদের ঘরটি ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে, বাবার ও আমার কাপড় কেচে ও চরখা কেটেই সকাল বেলাটা কাটিয়ে দিতাম। শীতের দিন ছিল। উত্তর ভারতের সবচেয়ে ভাল সময়। প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে যারা নিরক্ষর ছিল, তাদের হিন্দী, উর্দু ও অন্যান্য বিষয় পড়ানোর জন্য ক্লাস খোলার অনুমতি পেয়েছিলাম। দুপুরবেলা ভলি বল খেলা হত।

ক্রমশঃ বিধিনিষেধ বাড়তে লাগল। আমাদের নিজস্ব এলাকার বাইরে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন পড়ানোর ক্লাসও বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় সেই সময়ই আমি জেল থেকে ছুটি পেলাম।

মার্চের শুরুতে বাইরে এলাম, আর তার ছ' সাত সপ্তাহ পরে এপ্রিল মাসে আবার ফিরে গেলাম। তখন এসে দেখতে পেলাম অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বাবাকে নৈনিতাল জেলে পাঠানো হয়েছে। তাঁর চলে যাওয়ার ঠিক পরেই নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। যে বড় তাঁত-ঘরে আমরা থাকতাম, সেখান থেকে সব কয়েদীকে জেলের ভেতরে অন্য ব্যারাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যারাকগুলি জেলের ভেতরে আরেকটি জেলের মতন। অন্য ব্যারাকের কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলার অনুমতি ছিল না। দেখা করা ও চিঠি লেখা কমিয়ে মাসে একবার করে দেওয়া হয়েছিল। খুব সাদামাটা খাবার খেতে দেওয়া হত, তবে খাবার জিনিস বাইরে থেকে আনানোর অনুমতি ছিল।

যে ব্যারাকে আমাকে রাখা হল সেখানে প্রায় আরো পঞ্চাশজন কয়েদী ছিল। সকলকে একসঙ্গে একই জায়গায় ঠেসে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের

বিছানাগুলির মধ্যে তিন চার ফুটের বেশী দূরত্ব ছিল না। সুখের বিষয়, ঐ ব্যারাকে প্রায় সকলেই আমার পরিচিত ও কয়েকজন বন্ধুও ছিল। কিন্তু সারাদিন একলা হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় অসহ্য লাগত। দিনরাত ঐ লোকগুলির সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের ছোট খাট ঝগড়া চলতেই থাকা, এই সবকিছু থেকে দূরে শান্তির কোনো নিভৃত স্থান ছিল না। আমরা সকলের সামনে স্নান করতাম, সকলের সামনেই কাপড় কাচতাম, ব্যায়ামের জন্যে ব্যারাকের ভেতরেই চারদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়তাম। আলোচনা আর বিতর্ক এতদূর গড়াত যে আমাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ত, ভেবেচিন্তে কথা বলার মতো ক্ষমতা থাকত না। এ যেন আত্মীয় পরিবৃত জীবনের অবাঞ্ছনীয় কতগুলি ঘটনা ও দৃশ্য, যেখানে সেই জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য ও সুখ-সুবিধার অংশ খুব কমই ছিল। সঙ্গীরাও ভিন্ন রুচি ও স্বভাবের ছিল। সকলের মনেই একটি উৎকণ্ঠা থাকত, আমি একটু একলা থাকার জন্যে অস্থির হয়ে উঠতাম। কয়েক বছর পরে আমি জেলখানায় এই নিভৃতি ও একাকীত্ব পেয়েছিলাম। এমনই অবস্থা ছিল যে বেশ কয়েক মাস আমি জেল কর্মচারী ছাড়া অন্য কারুর মুখ দেখিনি। তখনও আমার মন অস্থির হত—কিন্তু তখন মনের মতো সঙ্গীর অভাব অনুভব করতাম। সেই সময়ে কখনো কখনো, ১৯২২ সালে লখনউ জেলে অনেকে একত্রে থাকার কথা মনে পড়ে, মন খারাপ হত। তবু আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে এই দুই অবস্থার মধ্যে একলা থাকাই আমার বেশী পছন্দ। শর্ত একটাই,—আমাকে লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে হবে।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমার সেই সময়কার সঙ্গীরা সকলেই খুব ভালো ও হাসিখুশী স্বভাবের ছিলেন। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ সদ্ভাবও ছিল। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের সকলেরই মাঝে মাঝে অপরের সঙ্গ অসহ্য মনে হত, তখন নিরালায় কিছুক্ষণ একলা থাকতে চাইতাম। সবচেয়ে বেশী একলা হওয়ার সুযোগ পেতাম যখন আমি ব্যারাক ছেড়ে পাঁচিলের কাছে খোলা জায়গায় গিয়ে বসতাম। বর্ষার সময় ছিল। মেঘলা হলে বাইরে গিয়ে বসা যেত। আমি তো গরম, এমন কী বৃষ্টির ছাটও সহ্য করতাম, আর বেশীর ভাগ সময়টা ব্যারাকের বাইরেই কাটাতাম।

খোলা জায়গায় শুয়ে আমি আকাশ আর মেঘ দেখতাম, অনুভব করতাম

মেঘের নিত্য-নতুন রং কত সুন্দর! এই সৌন্দর্য আমি আগে কখনো দেখিনি।

আহ! মেঘমালার এই
পলে পলে বদলানো রূপ,
কী মধুর স্বপ্ন এ যে
শুয়ে শুয়ে সেই খেলা দেখা!

সময়টা আমার কাছে সুখের ও আনন্দের ছিল না,—মনটা সর্বদাই ভারাক্রান্ত থাকত। শুধু যেটুকু সময় আমি বর্ষার মেঘের প্রতি পলে বদলানো রূপ দেখে কাটাতাম, সেটুকু সময় আনন্দে ভরে থাকত, আর আমি মনে শান্তি পেতাম। আমি যেন নতুন আবিস্কারের আনন্দ পেতাম, মনে হত আমি যেন আমার বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

জানিনা, বিশেষ করে সেই বর্ষা ঋতুটি আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করল কেন। আমি অনেকবার পাহাড়ে ও সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখেছি। সেই দৃশ্য সত্যিই সুন্দর। সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পেয়েছি; তার মহান শোভা ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছি; কিন্তু তারপরেই মনে হয়েছে এ তো নিত্যকার ঘটনা, আবার অন্য কোনো ব্যাপারে মন দিয়েছি। জেলে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখা যেত না। দিগন্ত দৃষ্টির অগোচরেই থাকত। সকালের সূর্য অনেক উত্তাপ নিয়ে আমাদের প্রহরী-সদৃশ প্রাচীরের উপরে অনেক দেরীতে দেখা দিত। কোথাও কোনো রঙের খেলা নজরে আসত না। আমাদের চোখ সেই বিবর্ণ দেয়াল ও ব্যারাকের দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। নানা রকম আলোছায়া ও রঙের খেলা দেখার জন্যে তারা উন্মুখ হয়ে থাকত। তারপর বর্ষার মেঘেরা যখন ছেলেমানুষী খেলায় মেতে, নানারকম রূপ ধরে, নানান রঙে সেজে, হাওয়ায় নাচতে থাকত আমি তখন বিস্ময়ে, আনন্দে অধীর হয়ে পাগলের মতো তাদের দেখতাম। কখনো আবার মেঘের দল এলোমেলো হয়ে গেলে মেঘের জটলায় ফাটল ধরত, আর তার ভেতর দিয়ে বর্ষা ঋতুর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যেত। সেই ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত গভীর নীল আকাশ নজরে আসত, যাকে সেই অনন্তেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ বলে মনে হত।

ক্রমশঃ বিধিনিষেধ বাড়তে লাগল, আরো বেশী কড়া নিয়ম চালু হল।

সরকার আমাদের আন্দোলন মাপ-জোপ করে নিয়েছিলেন, আর আমাদের জানিয়ে দিতে চাইছিলেন যে সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধতা করার সাহস দেখানোর জন্য তিনি আমাদের উপর কতটা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। নতুন নিয়ম চালু করা ও সেই নিয়ম কার্যকরী করার প্রণালী নিয়ে জেল কর্মচারী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হল। বেশ কয়েকমাস ঐ জেলে আমরা যে কজন ছিলাম, সংখ্যায় কয়েক শো, প্রায় সকলেই এই নিয়মের বিরুদ্ধতা করে দেখা সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অতএব ধরে নেওয়া হল আমাদের মধ্যে কয়েকজন কলহ-পরায়ণ, আর সেই কারণে সাতজনকে জেলের একটি দূরবর্তী অংশে বদলী করে দেওয়া হল এবং একটি বিশেষ ব্যারাকে আলাদা করে রাখা হল। এইভাবে যাদের আলাদা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আমি ছিলাম, সেইসঙ্গে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, মহাদেব দেশাই, জর্জ জোসেফ, বালকৃষ্ণ শর্মা এবং দেবদাস গান্ধী ছিলেন।

ছোট একটা ঘেরা জায়গায় রাখা হলো আমাদের। সেখানে থাকতে একটু কষ্টই হত, কিন্তু সব মিলিয়ে এই পরিবর্তনে আমি খুশীই হয়েছিলাম। এখানে ভীড় ছিল না, আমরা বেশ শান্তিতে, একটু বেশী নিরালায় বাস করছিলাম। পড়াশোনা ও অন্য কাজের জন্যে অনেক সময় পেতাম। জেলের অন্য অংশে আমাদের কয়েদী বন্ধুদের থেকে আমাদের পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল, এবং সেইসঙ্গে বাইরের জগত থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ রাজনৈতিক বন্দীদের সংবাদ পত্র পড়তে দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমরা খবরের কাগজ পেতাম না, কিন্তু বাইরে থেকে কোনো কোনো খবর ভেতরে ঢুকে পড়ত, যেমন জেলের মধ্যে হামেশাই ঢুকে পড়ে। আমাদের মাসিক দেখাসাক্ষাত ও চিঠির মাধ্যমেও মাঝে মাঝে এইসব খবর পেয়ে যেতাম। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে বাইরে আমাদের আন্দোলন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সেই অত্যাশ্চর্য যুগের অবসান হয়েছে, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও আমাদের সাফল্য দূরাগত বলে মনে হল। বাইরে কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল,—পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনশীল। প্রথম দলের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আমার বাবা। তাঁরা চাইতেন আগামী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ নিক এবং সম্ভব হলে কাউন্সিলের উপর আধিপত্য বিস্তার করুক। দ্বিতীয়

দলের নেতা রাজগোপালাচারিয়া ছিলেন। তিনি অসহযোগের পুরোনো কার্য-পদ্ধতির কোনো প্রকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন। সেই সময়ে গান্ধীজীও জেলে ছিলেন। আন্দোলনের যে সুন্দর আদর্শকে আমরা জোয়ারের তরঙ্গে ভাসিয়ে এতটা পথ এগিয়ে এনেছিলাম, ছোট-খাটো ঝগড়া আর ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে উথাল-পাথাল হয়ে তা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল। এ কথা অনুভব করছিলাম যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সময়ে বড় বড় সাহসের কাজ করে যাওয়া, পরবর্তীকালে প্রাত্যহিক কাজ চালানোর চেয়ে কত সহজ। বাইরের খবরে আমাদের উৎসাহ নিভে আসছিল। সেই সঙ্গে কারাবাস কালে মনের মধ্যে যে নানান প্রতিক্রিয়া হয়, তার কারণে আমাদের সেখানে থাকা আরো দুরূহ হয়ে উঠল। তবু আমাদের মনে একটা তৃপ্তির ভাবনা ছিল, কারণ আমরা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরব সুরক্ষিত রেখেছি, আর সত্যের পথে চলেছি, তার ফলাফল যাই হোক না কেন। ভবিষ্যতে কী হবে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; কিন্তু ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, আমাদের মনে হত আমাদের কয়েকজনের জীবনের বেশীর ভাগ অংশ জেলের ভেতরেই কাটাতে হবে। নিজেদের মধ্যে এইসব কথা আলোচনা করতাম। আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে জর্জ জোসেফের সঙ্গে একবার এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছিল, আর আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলাম। সেই দিনগুলির পরে জোসেফ আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল, এমন কী আমার কাজের একজন ঘোরতর সমালোচক হয়ে উঠল। কী জানি লখনউ জেলের সিভিল ওয়ার্ডে, শরতের এক সন্ধ্যায় আমাদের সেই বাক্যালাপ তার কখনো মনে পড়ে কী না।

রোজই আমরা কোনো কাজ আর ব্যায়াম করার জন্যে জড়ো হতাম। ব্যায়ামের জন্য আমরা আমাদের ছোট চৌহদ্দির ভেতরেই দৌড়ে দৌড়ে চক্কর লাগাতাম, কিংবা দুটি বলদের মতো দুজন ব্যক্তি মিলে কুয়া থেকে একটি বড় চামড়ার ডোলে জল টেনে তুলতাম। এইভাবে আমরা আমাদের এলাকার একটি ছোট শাক-সবজির খেতে জল দিতাম। আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোক রোজ কিছুটা সূতো কাটত। কিন্তু সেই শীতের দিন ও দীর্ঘ রাতগুলিতে পড়াশোনা করাই আমার প্রধান কাজ ছিল। সুপারিনটেনডেন্ট প্রায় যখনই এসেছেন আমাকে পড়াশোনা করতে দেখেছেন। পড়াশোনা

করার এই অভ্যাস তাঁর কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছিল, এই নিয়ে তিনি একবার কিছু বলেও ছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে তাঁর পড়াশোনা তিনি বারো বছর বয়সেই শেষ করে দিয়েছিলেন। ভালোই, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সেই বাহাদুর ইংরেজ কর্নেলের লাভই হয়েছিল,—তাঁর মনে অশান্তির সৃষ্টি করার মতো কোনো চিন্তা কোনোদিন জন্ম নেয়নি আর সম্ভবত সেই কারণেই পরে তিনি যুক্ত প্রদেশের জেলাগুলির ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন।

শীতের সুদীর্ঘ রাত আর ভারতবর্ষের পরিস্কার আকাশ নক্ষত্র বিষয়ে আমাকে কৌতূহলী করেছিল। কয়েকটি নক্‌শার সাহায্যে আমি বেশ কিছু তারা চিনেছিলাম। প্রতি রাতে আমি তাদের ফুটে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করতাম, এবং দেখা পেলে একান্ত পরিচিতজনের দর্শন পাওয়ার আনন্দে তাদের অভ্যর্থনা জানাতাম।

এইভাবে আমরা আমাদের সময় কাটাতাম। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ গড়িয়ে মাস। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ধারায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর সমস্ত দায়িত্ব মহিলাদের, আমাদের মা, স্ত্রী ও বোনেদের উপর এসে পড়েছিল। তারা প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, প্রিয়জনেরা যখন কারাগারে বন্দী, নিজেদের স্বাধীনতাও তাদের অসহায় মনে হত।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি প্রথমবার গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই এলাহাবাদে আমাদের বাড়ি 'আনন্দ ভবনে' প্রায়শই পুলিশ আসা-যাওয়া শুরু করল। আমার ও বাবার যে জরিমানা হয়েছিল, ওরা সেই জরিমানা আদায় করতে আসত। কংগ্রেসের নীতি ছিল জরিমানা দেওয়া হবে না। এই কারণে পুলিশ রোজই আসত এবং কোনো না কোনো আসবাব উঠিয়ে নিয়ে যেত। বার বার এইভাবে জিনিস উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আমার দশ বছরের মেয়ে ইন্দিরার খুব রেগে যেত। সে পুলিশের বিরোধীতা করে তীব্রভাবে নিজের অসন্তোষ জানিয়ে ছিল। আমার আশঙ্কা, পুলিশ সম্বন্ধে ছোটবেলার এই অভিজ্ঞতা, পরবর্তী জীবনে তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করবেই।

জেলের ভেতরে সাধারণ কয়েদীদের থেকে আমাদের আলাদা করে

রাখার চেষ্টা করা হত। সাধারণত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে পৃথক জেলের ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা করাও সম্ভব ছিল না, ঐ কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত। তাদের কাছ থেকে এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছিলাম সেই সময়ে জেলের জীবন বাস্তবে কেমন ছিল। তা ছিল অত্যাচার, জোর করে ঘুষ আদায় ও ভ্রষ্টাচারের একটি কাহিনী। অদ্ভুত রকমের খারাপ খাবার খেতে দেওয়া হত। আমি অনেকবার সেই খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই খেতে পারিনি। কর্মচারীরা সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল, খুব কম মাইনে পেত তারা। কিন্তু কয়েদী বা তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সুযোগ মতো টাকা আদায় করার পথ সম্পূর্ণ ভাবেই খোলা ছিল। জেল-ম্যানুয়েলে জেলর, তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ওয়ার্ডারের নানান কর্তব্য এবং উত্তর দায়িত্বের যে দীর্ঘ তালিকা ছিল, সততা ও যোগ্যতার সঙ্গে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই তা পালন করা সম্ভব ছিল না। যুক্তপ্রদেশের (এবং সম্ভবত অন্যান্য প্রদেশেরও) জেল-শাসন নীতির সঙ্গে কয়েদীদের সংশোধন করা, তাদের শিষ্টাচার ও উপযুক্ত রোজগারের উপায় শেখানোর কোনো সম্পর্কই ছিল না। শাস্তি পাওয়া লোকগুলিকে বিরক্ত করা, ভয় দেখিয়ে ও জুলুম করে তাদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন করে তোলাই ছিল জেলের একমাত্র উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা; যাতে যখন তারা জেল থেকে ছাড়া পাবে, তখন এই ভয় ও ত্রাসকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অপরাধ করে জেলে আসা থেকে বিরত থাকে।

গত কয়েক বছরে এই অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও জামাকাপড় ইত্যাদিতে অনেক সংশোধন হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাওয়ার পর বাইরে এসে আন্দোলন করার ফলে বেশীর ভাগ সংশোধন সম্ভব হয়েছে। অসহযোগের জন্যে ওয়ার্ডারদের মাইনেও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। অল্পবয়সী কয়েদীদের লেখাপড়া শেখানোর জন্যেও অল্পবিস্তর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এত পরিবর্তন সত্ত্বেও আসল সমস্যার সামাধান হয়নি, এখনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেই পুরোনো ধারাই বজায় রয়েছে।

বেশীর ভাগ রাজনৈতিক বন্দীকেই সাধারণ কয়েদীর প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যবহারই সহ্য করতে হয়। তাদের কোনো বিশেষ অধিকার

দেওয়া হয় না, কোনো বিশেষ ব্যবহারও করা হয় না তাদের সঙ্গে। কিন্তু তারা অন্যদের চেয়ে বাকপটু ও বুদ্ধিমান হওয়ায় তাদের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধে আদায় করা সহজ হয় না, টাকা পয়সাও নেওয়া যায় না তাদের কাছ থেকে। এই কারণে কর্মচারীরা তাদের অপছন্দ করে, আর তাদের দ্বারা কোনোভাবে জেলের নিয়ম ভঙ্গ হলে, সুযোগ পেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়। এইভাবেই নিয়ম ভাঙার জন্যে পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটি ছেলেকে (যে বলত তার নাম 'আজাদ') কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাকে নগ্ন করে একটি কাঠের তৈরি কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে বেত মারা হয়। প্রতিবার বেতের আঘাতে তার চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছিল, আর সে 'মহাত্মা গান্ধীর জয়' বলে চিৎকার করে উঠছিল। প্রত্যেকটি বেতের আঘাতের সঙ্গে ছেলেটি এইভাবেই চিৎকার করছিল, যতক্ষণ না সে তার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। পরে এই ছেলেটিই উত্তর ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতা হয়েছিল।

জওহরলাল নেহরুর আত্মকথা থেকে উদ্ধৃত

জেলের ভেতরে

হাজারীবাগ জেলের জেলরবাবু নারায়ণপ্রসাদ আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। ওঁর বড় ভাই আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়তেন, যাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে যেতাম। উনি খুব কর্মকুশল ও বিচক্ষণ জেলর ছিলেন। যেখানে রামদয়ালবাবু, শ্রী বাবু, বিপিনবাবুরা ছিলেন, উনি আমাকে সেখানেই রেখেছিলেন। জেলে পড়াশোনা করে ও সূতো কেটে সময় কাটাতাম। পরে সুপারিনটেনডেন্ট মেজর আয়েংগারকে বলে কাপড় ও নেয়ার তৈরির কারখানায় কাজ নিয়েছিলাম। এই পাঁচ-ছয় মাসে আমি প্রায় দুশো গজ কাপড় বুনেছিলাম। ঐ কাপড় আমার চরখায় কাটা সূতোয় বোনা ছিল না,—ঐ সূতো জেলেই পেয়েছিলাম, এই কারণে তা সেখানেই রেখে এসেছি। তবে আসার সময়ে দাম দিয়ে ঐ নেয়ার কিনে নিয়েছিলাম। আমি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম আর ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকার পর মুক্তি পেয়েছি। সময় কাটতে দেরী হয় না।

ইতিমধ্যে দীপনারায়ণ সিংহ সেখানে এসে পৌঁছলেন। উনি আমার সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বামী ভবানীদয়ালও ঐ ওয়ার্ডেই থাকতেন। অন্য ওয়ার্ডে যে সঙ্গীরা ছিলেন তাঁরা জেলরের অনুমতি নিয়ে যখন-তখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চলে আসতেন, আমরাও তাদের ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা করতাম। কোনো ব্যাপারে অসুবিধে ছিল না। শুধু বই-এর ব্যাপারে কিছু বাধা ছিল। পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট পাস না করা পর্যন্ত আমরা কোনো বই পেতাম না। যিনি পাস করতেন সেই ভদ্রলোক খুব বেশী লেখাপড়া করেছেন বলে মনে হয় না। যে বই-এর নামের মধ্যে কোনরকম ভাবে 'পলিটিকস' বা পলিটিকাল শব্দটি রয়েছে, সে বই তিনি কিছুতেই পাস করতেন না। আর ঐ শব্দ না থাকলে, সেই বই ওনার বিচারে যতই খারাপ হোক না কেন, উনি তা পাস করে দিতেন। উদাহরণ হিসেবে একটা মজার কথা শোনাচ্ছি।

একজন কলেজে পাঠ্য একটি অর্থনীতির বই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, বইটির নাম 'টেকস্ট বুক অফ পলিটিকাল ইকনমি,' উনি সেই বই না-মঞ্জুর করে দিলেন। কারণ নামের মধ্যে 'পলিটিকাল' শব্দটি রয়েছে! অথচ 'এ.বি.সি. অফ কম্যুনিজম' এবং 'থিয়োরি অফ লেবর ক্লাস' পাস করতে দ্বিধা করেন নি। প্রথম বইটি কী মনে করে পাস করেছিলেন জানিনা, তবে আমাদের অনুমান দ্বিতীয় বইটির বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল যে যাদের প্রচুর অবসর, তাদের সময় কাটানোর নানান উপাদান আছে এই বইয়ে।

জেলে বসে ভাবলাম যে গান্ধীজীর বেশীর ভাগ রচনা সাপ্তাহিকীর ফাইলের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। যদিও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশক গণেশন সেগুলি একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, আর তার জন্যে আমি লম্বা একটি ভূমিকাও লিখেছি, তবু আমার মনে হল যদি এক একটি বিষয়ের সমস্ত লেখা নিয়ে আলাদা আলাদা সংগ্রহ ছাপা হয়, এবং শুরুতে ছোট একটি ভূমিকায় ঐ লেখাগুলির সারাংশ দেওয়া হয়, যাতে পাঠক ঐ বিষয়ে তাঁর মতামত অল্প কথায় জেনে নিয়ে, তারপর তাঁর নিজের ভাষায় বিস্তারিত ভাবে বিষয়টি অধ্যয়ন করে, তাহলে ভালো হয়। সেই কারণে আমি লেখাগুলি কয়েকটি ভাগে ভাগ করলাম, যেমন—অহিংসা, স্বরাজ্য, সত্যাগ্রহ, শিক্ষা, খাদী ইত্যাদি। তারপর প্রতি বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখলাম, যাতে তাঁর চিন্তাধারার সারাংশ রয়েছে। রচনাগুলি বেছে নিলাম। কয়েকজন বন্ধু আলাদা আলাদা করে লেখাগুলি নকল করে দিল। আমার ভূমিকা লেখাও সম্পূর্ণ হল। এমন সময়ে আমি মুক্তি পেলাম।

বাইরে আসার পর আর সময় পেলাম না যে লেখাগুলি আরেকবার দেখে নিয়ে ছাপতে দিই। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করেছি এমন কাজে তাঁর সম্মতি আছে কী না। তিনি অনুমতি দিলেন। একথাও জানালেন যে কিছুদিন আগেই গুজরাতি ভাষায় এই ধরনের একটি সংগ্রহ ছাপা হয়েছে। আরো কয়েকজন বন্ধুরও এটি পছন্দ হল। বিশেষ করে পুরুলিয়ার নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত খুব পছন্দ করলেন। উনি ভূমিকায় কিছু সংশোধনের কথাও বলেছিলেন, যা করতে আমি সম্মত হয়েছিলাম। ১৯৩১ সালে লেখাগুলি প্রেসে দেওয়া গেল না। ১৯৩২ সালে আমরা আবার গ্রেপ্তার হলাম। সদাকত আশ্রমও অধিকৃত হল। ব্যস, ঐ লেখাগুলি আর খুঁজে

পাইনি। কে জানে কোথায় রাখা হয়েছিল, কী করেই বা অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেলের ভেতরে চরখা চালানো ও নানারকম কারুশিল্প ছাড়াও, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত। ছাপরার পণ্ডিত ভরত মিশ্রজী আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বাল্মিকী রামায়ণ এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্লর কাছ থেকে দুর্গা সপ্তশতী শুনতাম। প্রথমবার মূল উপনিষদ আদ্যোপান্ত নিজে পড়ে ফেললাম।

যেমন আগেই বলেছি হাজারীবাগ জেলে প্রদেশের প্রায় সব জিলা থেকে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীরা এসেছিলেন। আমি সারা প্রদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি, কংগ্রেসের প্রায় সকল কর্মীকেই চিনতাম। তবে জেলের ভেতরে যতদিন তাদের সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছি, সেরকম বাইরে কখনো পাইনি। সেখানেই স্বামী ভবানীদয়ালের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একত্রে থেকে আমরা পরস্পরকে জানাশোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই স্মৃতি চিরকাল একটি মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে। মুজফ্ফরপুর জিলার ঠাকুর নবাব সিংহ একজন প্রাচীনপন্থী বয়স্ক ভদ্রলোক,—কিংবা তিনি ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না বলাই ঠিক হবে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অনেক গ্রাম্য মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। বিহারে গ্রামের মানুষের উপর বিশেষভাবে প্রভাব পড়েছিল। ঠিক তার পাশেই যুক্তপ্রদেশে সবচেয়ে বেশী প্রভাব শহরেই পড়েছিল। চম্পারণে গান্ধীজীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গ্রামের লোকেরা পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে গ্রামবাসী কৃষকের মধ্যেও তার অনেক প্রভাব পড়েছিল। সেই প্রভাবে পড়েই ঠাকুর নবাব সিংহ এই আন্দোলনের শুরুতেই যোগ দিয়েছিলেন। তিনি একা এসে যোগ দেননি। ছেলে, ভাইপো, নাতি সকলকে সঙ্গে এনেছিলেন। সীতামড়ী সাবডিভিশনে যা কিছু হওয়ার, যা কিছু করার হত, ঠাকুর নবাব সিংহের উপর তার ভার পড়ত। তিনিই নেতৃত্ব করতেন। আধুনিক রীতিতে শিক্ষিত না হয়েও তিনি সুবিবেচক ছিলেন, সব কিছু শীঘ্র বুঝে ফেলতেন। কংগ্রেসের আজ্ঞা পালন করতে ও করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। উনি এবং তাঁর পুত্র আমার সঙ্গে একই জেলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও ভালো করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমি সেখানেই পেয়েছি। উনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস অটল রেখেছিলেন। ১৯৪২ সালের আগষ্টে গান্ধীজী এবং অন্য অনেকে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে যে বিক্ষোভ শুরু হল, তাতে তিনি সেই একই উৎসাহ,

নির্ভীকতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শরীক হলেন, যেমন তিনি আন্দোলনের শুরুতে হয়েছিলেন। সীতামড়ী নেপালের কাছে। তিনি পুলিসের উপদ্রব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কাজ করার জন্যে নেপালের তরাই অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকেই কংগ্রেসের জন্য কাজ করতে লাগলেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং আমরা জেলে বসেই শুনলাম তিনি দেহ রক্ষা করেছেন।

স্বামী সহজানন্দও জেলে ছিলেন। অনেকে তাঁর কাছে গীতা পড়ত। আমারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তা পূর্ণ হয়নি। তবে আমার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশী বেড়েছিল নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তর সঙ্গে। তিনি একজন সাধু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে কেবল মাত্র একটি রাজনৈতিক বিপ্লব না মনে করে ধর্মীয় উত্থানের একটি সাধন মনে করতেন। আমরা তাঁর কাছে পাতঞ্জলির যোগসূত্র পড়তাম। তখনই তাঁর জ্ঞান ও গভীর বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পেয়েছি। এ কথাও বুঝেছিলাম যে উনি কী ভাবে শাস্ত্রের ঐ নিয়মগুলির অনুসারে নিজের জীবন চালিত করার চেষ্টা করেছেন। কিছুকাল পরে ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়ে উনি এমন একটি স্থান শূন্য করে গেলেন, যা এখনও পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি।

জেলে কয়েকটি ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কয়েকজন কয়েদী মিলে 'বন্দী' অথবা 'কয়েদী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেছিল। অন্য কয়েকজনে মিলে 'কারাগার' নামে দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা বার করল, যাতে লেখা হল—কয়েদী বা বন্দী তো আসা-যাওয়া করে, বদলাতে থাকে, কিন্তু কারাগার চিরস্থায়ী! এই পত্রিকাগুলিতে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা হত। একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রত্যেকটি জিলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী তাঁদের নিজ নিজ জিলার আন্দোলনের প্রগতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমার ধারণা তাতে এমন অনেক তথ্য ছিল যার সাহায্যে এই আন্দোলনের ইতিহাস লেখা যায়। জানি না সেই বিশেষ সংখ্যাটি কোথায় আছে। এই পত্রিকাগুলিতে মুখ্য সঞ্চালক ও লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন স্বামী ভবানীদয়াল, গঙ্গায়ার বাবু মথুরা প্রসাদ সিংহ, রামকৃষ্ণ বেণীপুরী এবং উৎসাহী যুবক মহামায়া প্রসাদ। দু'একটি সংখ্যায় কিছু ছবিও ছিল, যা আঁকার কৃতিত্ব গিধৌরের কুমার কালিকা প্রসাদ সিংহের ছিল।

এই জেল যাত্রায় আমার জেল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয়নি; কারণ প্রথমত অধিকাংশ লোকই একান্ত পরিচিত হওয়ায় অন্যদের নিয়ে বিশেষ চিন্তা করিনি; দ্বিতীয়ত সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগও বিশেষ পাইনি। আমাদের কাজ করে দেওয়ার জন্যে যে কয়েদীরা ছিল, অথবা আমি যখন কারখানায় নেয়ার বা কাপড় বুনতে যেতাম, তখন সেখানে যে কয়েদীরা কাজ করত তাদের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হত, অন্যদের সঙ্গে নয়। যাদের দেখা পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে অনেককেই ভালো লোক মনে হয়েছিল। সকলেই কোনো না কোনো কারণে জেলে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু চোখে পড়েনি যার জন্য তাদের দীর্ঘকাল বন্দী করে রাখা উচিত মনে হবে। এই সম্বন্ধে পরে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যার কথা অন্য কোনো সময়ে বলা যাবে।

প্রথম দিকে আমরা কোনো সংবাদপত্র পেতাম না, যার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করত। কিন্তু জেল এমন স্থান যেখানে ব্যবস্থা করলে সবই পাওয়া যায়। এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্যে লোকে একটি বিশেষ শব্দ খুঁজে বার করেছে। শব্দটি হলো 'তিকড়ম'। এই তিকড়মের সাহায্যে কোনো না কোনো সংবাদ-পত্র আনিয়ে নেওয়া হত। একজনের পড়া হলে সে অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিত। কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোক সকলের সম্মতি নিয়ে কোথা থেকে যেন খবর কাগজ আনিয়ে পড়ে নিতেন, এবং পরে সকলকে সেই খবর শুনিয়ে দিতেন। যখন খবর শোনানোর সময় আসত সকলে উৎসুক হয়ে তাঁর পথ চেয়ে থাকত। তাঁর স্মরণ শক্তি ও বলার ভঙ্গী এমন ছিল যে সকলেরই ভালো লাগত। সরকার কিছুদিন পরে সংবাদপত্র দেওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু সরকারী কাজ যেমন হয়ে থাকে, বলা হল 'সংবাদ-পত্র দেওয়া হয়' কিন্তু আমরা সপ্তাহে একবার একটাই কাগজ পেতাম, আর তাও 'স্টেটসম্যানে'র সাপ্তাহিক সংস্করণ! যা বিদেশীদের জন্যে ছাপা হত। তাতে এমন চিন্তাধারার প্রকাশ থাকত যা জানার জন্যে আমাদের মধ্যে কেউই উৎসুক ছিল না। এমন সব খবর থাকত যাতে বিদেশী পাঠকের আগ্রহই বেশী হত, আর যা এক সপ্তাহের পুরোনো হত। ভারতবর্ষে যারা বসবাস করে, বিশেষ করে যারা সত্যাগ্রহী, তাদের সেই খবরে কোনো আগ্রহ ছিল না। কোনো নিয়ম হিসেবেই হোক বা সংশোধন রূপেই হোক, বৃটিশ

সরকার যখনই কোনো সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অবস্থা এই রকমই হত। একটি জিনিস দেওয়া হল একথা বলতেই হয়, কিন্তু তাতে কোনো সার থাকে না, কোনো তত্ত্ব থাকে না। এই রকম জিনিস নিয়েই জেলে সময় কেটে যেত।

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের 'আত্মকথা' থেকে উদ্ধৃত

বাঁকীপুর (পাটনা) জেলের প্রতিজ্ঞা

স্বাধীনতা প্রত্যেক দেশের এবং দেশবাসীর জন্মসিদ্ধ অধিকার। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবাসী আজ স্বাধীন নয়। কিন্তু আমরা স্থির করেছি যে আমরা স্বাধীন হবই। পরাধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি যে এর জন্যে আমাদের কতখানি মানসিক, আত্মিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছে; এবং আমাদের উন্নতির জন্যে, সমাজের সেবায় সুযোগ্য অংশ নেওয়ার জন্যে এই পরাধীনতা দূর করা আবশ্যক। আমরা চাই প্রত্যেক দেশবাসী সুখী হোক—ক্ষুধা ও দারিদ্র, রোগ ও অশিক্ষা, পারস্পরিক ভেদ-বিভেদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের কুসংস্কার এখান থেকে দূরীভূত হোক। ধর্ম, জাতি, কুল ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের কাছেই উন্নতি ও বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি সাধন উপলব্ধ হোক।

এই মহান উদ্দেশ্যের সিদ্ধি আমাদের প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমরা তার প্রাপ্তির জন্যে অহিংসার পথ অবলম্বন করতে স্বীকৃত হয়েছি। আজ আমরা আবার আমাদের আশা ও অভিলাষাকে জাগরূক করছি এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের দেশকে স্বাধীন করব এবং স্বাধীনতা থেকে উপলব্ধ ঐশ্বর্য তার হাতে তুলে দেব।

(উপরের প্রতিজ্ঞাপত্রটি ১৯৪৩ সালের ২৬ জানুয়ারি পাটনার বাঁকীপুর জেলে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজ হাতে লিখেছেন এবং স্বাধীনতা দিবস রূপে নিজের জেলের সঙ্গীদের নিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রটি পড়তে পড়তে সংকল্প করেছিলেন।)

ছাত্রদের প্রতি

ছাত্রদের প্রতি :

(১৯৪২ সালে হাজারীবাগ জেল থেকে পালিয়ে, মাসাধিক কাল আত্মগোপন করে, জয়প্রকাশ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। আত্মগোপন করে থাকার সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতের তরুণ ছাত্রদের নামে জয়প্রকাশ একটি পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সেই পত্রের বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো।)

প্রিয় বন্ধুরা,

স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আবার তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারায় আমি যে কত আনন্দিত, তা বলে বোঝাতে পারব না।

সবচেয়ে প্রথমে আমি সেই তরুণ দেশভক্তদের স্মৃতিতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে চাই, যাদের অসীম বীরত্ব ও অনুপম আত্মত্যাগ আমাদের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জীবন্ত ইতিহাসে সুবর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। তাদের উদাহরণ আমাদের জন্য এক অমর প্রেরণা হয়ে থাকবে, এবং তাদের প্রতি ধিক্কার যারা দ্বিধাগ্রস্ত অথবা পশ্চাতমুখী।

এর পরে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন আপনাদের কাছে জ্ঞাপন করছি। অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে এ কথা স্বীকার করছি যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আমার দেশের ছাত্র সম্প্রদায় এত কিছু করতে সক্ষম হবে। ১৯২১ সালে ছাত্রেরা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল, তার গতি স্তব্ধ হয়েছে—এ কথা চিন্তা করাও অসম্ভব, তবু আমি সেই রকমেই মনে করেছিলাম। এই কারণে তোমরা যখন নানান বীরত্বের কাজ করে একটি ইতিহাস রচনা করছিলে, আমি তখন কারাগারের ঠাণ্ডা প্রাচীরের ভেতরে বসে বড় আনন্দে ও গর্বে দিনের পর দিন সেই সেই ঘটনাগুলি অনুসরণ করেছি। তোমরা যেমন খোলাখুলি ভাবে বিদ্রোহে অংশ নিলে এবং জীবন

উৎসর্গ করলে, তার সামনে ১৯২১-এর ঘটনা অত্যন্ত ম্লান মনে হয়।

কিন্তু বন্ধুরা, এখন হাল ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করার বা নিজের কীর্তির দিকে তাকিয়ে দেখার সময় নয়। আজকের সমস্যা এই নয় যে আমরা কতটা করেছি, বরং দেখতে হবে আমরা এখন কী করছি এবং পরে আরো কী করতে হবে। এই প্রশ্নগুলির বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই।

কয়েক সপ্তাহ হলো কলেজ খুলে গেছে আর তোমরা আবার পড়াশোনায় মন দিয়েছ বলে মনে হচ্ছে। আমি যদি বলি এটা পড়বার বা পরীক্ষা দেবার সময় নয়, তাহলে তোমরা বলবে আমি চর্বিত-চর্বণ করছি। কিন্তু রাশিয়া বা চীন, অক্সফোর্ড বা হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কী এই উপদেশ বিষয়ে এমন কথা ভাববে? তোমাদের অভিভাবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তি এবং দীর্ঘ ভাষণদানকারীদের পক্ষে এ কথা বলা স্বাভাবিক যে ছাত্রদের প্রধান কাজ হলো পড়াশোনা করে ডিগ্রী লাভ করা, এবং তার পরে যোগ্য হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করা, যাতে তারা উত্তমরূপে দেশের সেবা করতে পারে।

কিন্তু আমি মনে করি, এই ভাবে চিন্তা করা বা পরামর্শ দেওয়া বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ। সাধারণ সময়ে ছাত্রদের কর্তব্য হলো লেখাপড়া শিখে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা, যাতে তারা যোগ্য নাগরিক হতে পারে এবং নিজের সর্বোত্তম যোগ্যতায় দেশের সেবা করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের জীবনে এমন সময়ও আসে, যখন ব্যক্তির বিকাশ এই কারণে রুদ্ধ করতে হয় যাতে সমগ্র রাষ্ট্র জীবিত থাকে এবং বিকশিত হয়,—যখন সমাজের উন্নতির বেদীতে ব্যক্তির নির্ভয় ও নিষ্ঠুর বলিদান করতে হয়। ভেবে দেখো তো, রাশিয়া ও চীনের ছাত্রেরা কী এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, না নিজের দেশের অস্তিত্ব ও কীর্তি রক্ষা করার জন্যে হাসতে হাসতে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে চলেছে। ভেবে দেখো তো সেইসব দেশে কী শিক্ষক আর অভিভাবকেরা এই ধরণের কথা বলার সাহস রাখে, না তাদের সেইসব কথা কেউ সহ্য করে? কেম্ব্রিজ বা কলম্বিয়ার ছাত্রদের কী এই কারণ দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যায় যে আগে তাদের ডিগ্রী লাভ করা উচিত?

না বন্ধু, না। এমন সময় আসে যখন প্রাণ দিয়েও নিজের দেশকে রক্ষা করতে হয়, নিজের সভ্যতাকে বিকশিত করতে হয়। এখন সেই সময়।

আমাদেরও কষ্ট সহ্য করে, প্রাণ দিয়ে, নিজেকে বিলুপ্ত করে দেশকে স্বাধীন করতে হবে, নিজের সভ্যতাকে প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এই কারণে তোমরা দেশদ্রোহী ও ভীরু ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত কোরো না।

তাহলে এখন তোমরা কী করবে? তোমরা তোমাদের বৈপ্লবিক কার্যধারার সাহায্যে নিজেদের স্কুল ও কলেজ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হওনি। সেগুলি যে খোলা হচ্ছে এটাই তোমাদের পরাজয়। আমাদের সকলের পরাজয়। তোমরা কেন পিছিয়ে পড়ছ বুঝতে পারছি না। তোমরা বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ বুঝতে ভুল করেছ এ কথা কী করে বলি? আমাদের এই অন্তিম সংগ্রাম শুধু প্রদর্শনের বা ক্ষণিক উত্তেজনার বস্তু নয়। এ আরো গভীর ও ভয়ঙ্কর বস্তু, এবং বিজয় ছাড়া অপর আর কিছুতেই এর শেষ হতে পারে না। এই ব্যাপারে তোমরা ভুল কোরো না।

তোমাদের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে তা জানিনা, কিন্তু আমি যদি তোমাদের জায়গায় হতাম, তাহলে আগস্টের ঘটনার পরে স্কুল কিংবা কলেজে যাওয়ার স্বপ্নও দেখতাম না। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি যদি দু' এক বছর কলেজের বাইরে থাকা যায়, তাতে শিক্ষার কোনো ত্রুটি হয়না। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আমি এক বছর বাইরে বাইরে থেকেছি; আমেরিকায় পড়াশোনা করার সময়েও কখনো কখনো কয়েক মাস, কখনো বা কয়েক বছর আমি কলেজের বাইরে থেকে নিজের পড়ার খরচ জোগাড় করেছি। আমি তোমাদের একথা জানাতে আনন্দ অনুভব করছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যত শিখেছি, বাইরে তার চেয়ে কম শিখিনি। তাছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি এত অস্বাভাবিক, এত গোলক-ধাঁধায় ভরা, আর জীবনের যথার্থ থেকে এতটাই দূরে যে যদি তোমরা দু' এক বছরের জন্যে তাকে সেলাম জানিয়ে, রাষ্ট্রীয় জীবনের ঝঞ্ঝায় নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারো, তাহলে তোমাদের লাভই হবে।

মনে হচ্ছে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পরে তোমাদের খুব ফাঁকা লাগত, হাতে কোনো কাজ না থাকায় তোমরা বিষণ্ন বোধ করতে। কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি এখন শুধু কাজ আর কাজ। এত কাজ রয়েছে যা প্রত্যেকের জন্যেই প্রচুর মনে হবে। আমার তো একথাও মনে হচ্ছে যে যদি

বাড়িতে থেকে চাষবাসের কাজে মন লাগাতে, বা কয়েকটি শিশুকে পড়াতে, অথবা গ্রামের পরিচ্ছন্নতার কাজে লেগে গ্রামবাসীকে সুস্থ ও সুন্দর জীবনে অনুপ্রেরিত করতে, তাহলে নিজ হতেই দেশের একটি বড় কাজ হয়ে যেত। এমনি করেই তোমরা স্কুল-কলেজ খোলা রোধ করতে পারতে এবং শত্রুপক্ষকে সাহায্য করা থেকে অব্যাহতি পেতে,—কারণ এগুলি খোলা মানেই তো শত্রুর বিজয় ঘোষণা।

আজকের ঘটনা এই যে স্কুল ও কলেজ খুলে গেছে। আমি নিজের মধ্যে এতটা বিশ্বাস অনুভব করছি না যাতে তোমাদের আবার সেগুলি খালি করে দিতে অথবা বন্ধ করে দিতে বলব। আমার কথার গুরুত্ব তোমাদের কাছে কতখানি আমি তা জানি না। কিন্তু তোমরা যা করেছ সেই বিষয়ে তোমাদের ভ্রান্তিতে রাখতে চাই না। কিছু মনে কোরো না যদি বলি শিক্ষালয়ে ফিরে গিয়ে তোমরা নিজেদের ও তোমাদের নেতাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং আমার ভাষায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করেছ। শুরুতে তোমরা যে উদ্দেশ্যের জন্যে এত ত্যাগ করলে, তাকে এত এগিয়ে আনলে, তাকেই আবার নিজেদের কর্মের দ্বারা আহত করলে, ক্ষতিগ্রস্ত করলে। তোমাদের পথ পরিস্কার এবং খোলা—সেই পথে তোমরা চলো বা না চলো তোমাদের মর্জি।

যারা স্কুলে বা কলেজে থাকতে চায় তাদের জন্যেও অনেক কাজ আছে। নিজেদের দুর্বল মুহূর্তে অথবা বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে মনে করে তোমরা শিক্ষালয়ে ফিরে গেছ, কিন্তু এখনও সময় আছে, তোমরা ভেবে দ্যাখো। সবচেয়ে বেশী ভুল হবে যদি ভাবো বিদ্রোহ দমন হয়ে গেছে কিংবা তার জলধারা আজ বিশুষ্ক। 'স্বাধীনতার সৈনিকের নামে' লেখা আমার পত্রে আমি আগস্ট বিপ্লবের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিশ্লেষণ করেছি। এখানে ঐ কথাগুলির পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু দুটি ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করা প্রয়োজন। বিপ্লবের প্রথম পর্ব সফল হল, কারণ ভারতবর্ষের অনেক অংশ থেকে তা ইংরেজ রাজত্বকে উৎপাটন করেছে। এর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে তার কারণ এই নয় যে শত্রুর বিপুল ক্ষমতা তার পথ রোধ করেছে; বরং কারণ এই ছিল যে এর পেছনে সুসংবদ্ধ কোনো সংগঠন ছিল না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের

কয়েকটি কাজ করতে হবে। অগ্রগতির জন্য আমাদের এখন থেকেই সংগঠন, অনুশাসন এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। নষ্ট করার মতো একটি মুহূর্তও আমাদের কাছে নেই, সব কাজ অতি শীঘ্র করতে হবে। প্রস্তুতির প্রতি ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন। গ্রামে ও শিল্প কেন্দ্রে, রেলে ও খনিতে, সেনাদলে ও সরকারী প্রশাসনে কাজ করতে হবে। সাহিত্যের প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে। যোগাযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। সেনাদলের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, ধ্বংসের কাজে সকল কারিগরকে একত্রিত করতে হবে। এই সকল কাজে পদে পদে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ও বিরোধে অংশ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের অধীনে সংগঠনের একটি দল প্রস্তুত করার চেষ্টা চলেছে। বর্তমান যোগসূত্রের আধারে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হব এবং তোমাদের যোগ্য কাজে নিযুক্ত করব।

এই কাজের মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যা লেখাপড়া করার সঙ্গেই করা যায়, যেমন কিছু লোক এখনও করছে। আশাকরি সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়েও তোমরা আগস্টের মতোই বিপ্লবী সেনাদলের প্রথম সারিতেই থাকবে। কিন্তু এই পর্যায়ে শত্রুর ক্ষমতা যেন চিরকালের মতো বিনষ্ট হয়, এরজন্যে প্রয়োজন এই কাজে গভীর মনোনিবেশ করা এবং অতি সত্বর সংগঠনকে দৃঢ় করে তোলা।

তোমাদের অনেক কাজ করতে হবে। এই কারণে আমি তোমাদের বেশী সময় নিতে চাই না। তোমরা আমাকে অনেক আশার আলো দেখিয়েছ। এই আশা তোমাদেরই পূর্ণ করতে হবে। মনে রেখো, সারা পৃথিবীতে তরুণের দল আজ ভালো বা মন্দ উদ্দেশ্যে নিজ দেহের রক্তপাত করে চলেছে। চল্লিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কোনো মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না; তোমরা রাষ্ট্রীয় বা অর্ন্তরাষ্ট্রীয়, নৈতিক বা পার্থিব যে কোনো দৃষ্টিতেই বিচার কর না কেন। মানব সমাজের এক পঞ্চমাংশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে তোমরা স্বাধীনতা, শান্তি এবং উন্নতির অর্ন্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলের অগ্রগামী সেনানী হবে। পৃথিবীর কল্যাণভূমি এশিয়া এবং এশিয়ার কল্যাণভূমি ভারতবর্ষ।

বন্ধুরা, এগিয়ে চলো। রক্ত, অশ্রু এবং শ্রম—আমাদের ভাগ্যে লেখা

আছে, কিন্তু তার দ্বারাই আমাদের মাতৃভূমি এবং আমাদের দেশবাসীর স্বাধীনতা প্রাপ্তি হবে। আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের সৃষ্টি করব, সৃষ্টি করব একটি নতুন সমাজের।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

জয়প্রকাশ নারায়ণ

ভারতের প্রান্ত থেকে (১৯৪২ সাল)

তিনটি চিঠি

এক

(সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা পাওয়া গেছে, এই অভিযোগে পত্রটি সেন্সর দ্বারা রোধ করা হয়েছিল)

মান্দালয় সেন্ট্রাল জেল, আপার বর্মা
২০-৮-১৯২৫

প্রিয় শ্রী কেলকর,

গত কয়েকমাস ধরেই আপনাকে চিঠি লেখার কথা ভাবছি, তার কারণ আমি আপনাকে এমন কিছু জানাতে পারি, যা জানতে আপনি আগ্রহী হবেন। আমি গত জানুয়ারি মাস থেকে কারাবাসে আছি, এই খবর আপনি জানেন কী না জানিনা। যখন বহরমপুর জেল থেকে আমার মানডালে জেলে সরিয়ে আনার নির্দেশ এলো, তখন এ কথা মনে পড়েনি যে লোকমান্য তিলক তাঁর কারাবাস কালের অধিকাংশ ভাগ মানডালের জেলেই কাটিয়েছেন। আমি নিজে সশরীরে এখানে আসার অনেক আগেই, এই কারাগার ও হতোদ্যম করা এই পরিবেশে স্বর্গীয় লোকমান্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'গীতা-রহস্য' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যা আমার বিনীত সিদ্ধান্তে তাঁকে শঙ্কর এবং রামানুজের মতো মহান ভাষ্যকারের শ্রেণীতে স্থাপন করে দিয়েছে।

যে ওয়ার্ডে লোকমানা থাকতেন তা আজও সুরক্ষিত রয়েছে, যদিও তাতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডের মতোই তা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি, যাতে গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া ও রোদ থেকে, বর্ষায় বৃষ্টির জল থেকে, শীতকালে ঠাণ্ডা থেকে এবং প্রতি ঋতুতে ধুলো ভরা ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। আমি এখানে এসে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই আমাকে এই ওয়ার্ডের পরিচয় দেওয়া হল। আমাকে

ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করা হলো এই ব্যাপারটি আমার ভালো লাগেনি, তবু আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আমি মাতৃভূমি ও স্বদেশে উপস্থিত না থাকলেও এই মানডালের পবিত্র স্মৃতি আমাকে শান্তি ও প্রেরণা দেবে। অন্য যে কোনো জেলের মতো এই জেলটিও কুশ্রী, নীরস ও অরুচিকর, কিন্তু আমার কাছে এ এক তীর্থস্থল যেখানে ভারতের এক মহান পুরুষ একাদিক্রমে ছয় বছর কাটিয়ে গেছেন।

আমরা সকলেই জানি যে লোকমান্য কারাগারে ছয় বছর কাটিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস খুব কম লোকই জানেন যে সেই সময়ের মধ্যে তাঁকে কতটা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। তিনি এখানে একলা থাকতেন এবং নিজের মানসিক স্তরের কোনো সঙ্গী এখানে পাননি। আমার বিশ্বাস, অন্য কোনো বন্দীর সঙ্গে তাঁকে মেলামেশা করতে দেওয়া হত না। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো একমাত্র বস্তু ছিল বই এবং তিনি একটি ঘরে একদম একা থাকতেন। এখানে থাকাকালীন তাঁকে দুই বা তিনবারের বেশী কারো সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর সাক্ষাতও পুলিশ বা জেল কর্মচারীর উপস্থিতিতে হয়ে থাকবে, যে কারণে তিনি কখনোই প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন নি।

কোনো সংবাদ-পত্র তাঁর কাছে পৌঁছত না। তাঁর মতো একজন প্রতিষ্ঠিত নেতাকে বাইরের পৃথিবীর ঘটনাক্রম থেকে পৃথক করে রাখা মানে এক ধরনে যন্ত্রণা দেওয়া, এই যন্ত্রণা যাকে সহ্য করতে হয়েছে সেই জানে। তাছাড়া তাঁর কারাবাসের অধিকাংশ সময়ে দেশের রাজনৈতিক জীবন অতি ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং এই কথা চিন্তা করে তিনি নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন যে যে মহান উদ্দেশ্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তাঁর শারীরিক যন্ত্রণা বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। তিনি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছিলেন, এবং আজকের রাজবন্দীদের তুলনায় তাঁর দিনযাপন অনেকাংশে কঠিন হয়ে থাকবে। তাছাড়া তিনি ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন। যখন লোকমান্য এখানে ছিলেন মানডালের আবহাওয়া তখনও নিশ্চয়ই এইরকমই ছিল, যেমন এখন আছে। যদি আজকের যুবকেরা নালিশ জানায় যে এখানকার জলবায়ু ক্লান্ত করে দেয়, বদহজম ও বাতের



নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

জন্ম দেয়, এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণরূপে মানুষের জীবনী শক্তি শুষে নেয়, তাহলে বয়োবৃদ্ধ লোকমান্য কত কষ্ট সহ্য করে থাকবেন।

কিন্তু এই কারাগারের প্রাচীরের ভেতরে তিনি কত যন্ত্রণা সহ্য করেছেন সে বিষয়ে লোকে খুব কমই জানে। কজন লোক সেই অজস্র ছোট-খাটো ঘটনার কথা জানে যা বন্দীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। তিনি গীতার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, হয়ত সেই কারণেই দুঃখ ও যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেছিলেন। হয়ত সেই কারণেই তিনি এই বিষয়ে কাউকে কখনো কিছু বলেন নি।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি লোকমান্যকে কীভাবে তাঁর বহুমূল্য জীবনের ছয়টি দীর্ঘ বছর এই পরিস্থিতিতে অতিবাহিত করার জন্য বাধ্য হতে হয়েছিল, আর প্রতিবার আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি যে যুবকেরা যদি এখানে এত কষ্ট পায়, তাহলে মহান লোকমান্য সেই সময়ে কতটা পীড়া সহ্য করেছেন, যার বিষয়ে তাঁর দেশবাসী কিছুই জানতে পারেনি। এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি, কিন্তু জেল মানুষের কীর্তি চিহ্ন। এ এক অন্য পৃথিবী, যে চিন্তাধারা ও আচরণ আমাদের সভ্য সমাজ নীতিরূপে স্বীকার করেছে, জেলের ক্ষেত্রে তা গ্রাহ্য হয় না। আত্মার অবমাননা না করে বন্দী-জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। এর জন্য পুরোনো অভ্যাসগুলি ছেড়ে দিয়েও আমাদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হয়; সবরকম নিয়মকে নত মস্তকে মেনে নিয়েও মনের প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। দাস-বৃত্তি গ্রহণ করেও মানসিক স্থৈর্য অটুট রাখতে হয়। কেবলমাত্র লোকমান্যের মতো দার্শনিক তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বন্দী-জীবনের এই শক্তি হননকারী প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পারেন, সেই যন্ত্রণা ও দাসত্বের মধ্যেও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন এবং গীতা-ভাষ্যের মতো বিশাল এবং যুগ-নির্মাণকারী গ্রন্থ রচনা করতে পারেন।

কেউ যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে চান যে এত প্রতিকূল, শক্তি-হননকারী এবং দুর্বল করে দেওয়া পরিবেশে লোকমান্যের গীতা-ভাষ্যের মতো প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং মহান গ্রন্থের রচনা করার জন্যে কত প্রবল ইচ্ছাশক্তি, সাধনার গভীরতা এবং সহনশীলতার প্রয়োজন, তাহলে তাকে জেলে এসে থাকতে হবে। আমার নিজের কথা যদি বলি, এই বিষয়

নিয়ে আমি যত বেশী চিন্তা করি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে তত বেশী আপ্লুত হই। আশা করি আমার দেশবাসী লোকমান্যের মহৎ চরিত্র অঙ্কিত করার সময় এই তথ্যগুলির উপর দৃষ্টিপাত করবেন। যে মহাপুরুষ মধুমেহ দ্বারা পীড়িত অবস্থায় এত দীর্ঘ কারাবাসের যন্ত্রণা সহ্য করেও নিজের সমস্ত মানসিক ক্ষমতা ও সংঘর্ষ-শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এবং যিনি সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে নিজের মাতৃভূমির জন্যে এমন অমূল্য উপহার প্রস্তুত করেছেন, বিশ্বের মহাপুরুষ শ্রেণীর প্রথম পংক্তিতে তাঁর স্থান হওয়া উচিত।

কিন্তু লোকমান্য নিজের বন্দী জীবনে প্রকৃতির যে অটল নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, তারা তো প্রতিশোধ নেবেই। আমার বিশ্বাস, দেশবন্ধুর শরীর ত্যাগের সূচনা যেমন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, ঠিক সেইরকমই লোকমান্য যখন মানডালেকে তাঁর অন্তিম নমস্কার জানিয়েছিলেন, তখন তাঁর জীবনের অল্প কয়েকটি মাত্র দিন বাকী ছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি গভীর দুঃখের বিষয় যে আমরা আমাদের মহত্তম পুরুষদের এই ভাবে হারিয়ে চলেছি। কিন্তু আমি এ কথাও চিন্তা করি যে এই দুঃসহ দুর্ভাগ্য কী কোনোভাবেই পরিবর্তিত হতে পারত না?

শ্রদ্ধাসহ,
আপনার স্নেহভাজন
সুভাষ সি. বোস

শ্রী নৃসিংহ চিন্তামণি কেলকর সমীপে
পুণা

দুই

মানডালে সেন্ট্রাল জেল
২-৫-১৯২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪-৩-১৯২৫ তারিখে লেখা চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম। তোমার চিঠিটা এবার (তোমার ভাষায়) 'মিহি ছাঁকনীতে না ছেঁকেই' আমার

হাতে দিয়েছে ওরা,—এই কারণে আরো বেশী খুশী হয়েছি।

তোমার চিঠি আমার মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। এই চিঠির সঠিক উত্তর লেখা আমার পক্ষে সহজ নয়। আর তাছাড়া আমি যা কিছু লিখব সব 'সেন্সর' হয়ে তোমার কাছে পৌঁছবে, এই কথা ভেবেই আমার উৎসাহে ভাঁটা পড়ছে। কেউই চায়না তার মনের গোপন ভাবনাগুলিকে দিনের আলোয় টেনে আনা হোক, আর পাঁচটা আজে-বাজে লোক সেগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করুক। সেই কারণে পাথরের দেয়াল আর জেলখানার গরাদের মধ্যে বন্দী হয়ে আমি যা কিছু ভাবছি, যা কিছু অনুভব করছি, তার বেশীর ভাগ অংশ কোনোদিন ভাষায় প্রকাশ পাবে না।

এতগুলি লোককে কোনো অজানা অপরাধে জেলে ঢোকানো হয়েছে জেনে তোমার মতো নরম মনের মানুষের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ঘটনাটা যখন আমাদের স্বীকার করতেই হবে তখন ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখাই ভালো নয় কী?

জেলে থাকতে আমার ভালো লাগছে বললে মিথ্যে বলা হবে। জেলের এই পরিবেশ মানুষকে মানুষ থাকতে দেয় না,—তাকে বিকৃত করে দেয়। আমার ধারণা সব জেলেই কম বেশী একই অবস্থা। কারাগারে এসে অধিকাংশ বন্দীই তাদের নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘকাল জেলে থাকার পরে একথা মানতে বাধ্য হচ্ছি যে যত শীঘ্র সম্ভব বন্দীদের জীবনের আমূল সংশোধন দরকার। ভবিষ্যতে নিজে দায়িত্ব নিয়ে আমি এই সংশোধনের কাজে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। ভারতীয় জেল সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন একটি মন্দ ব্যবস্থার খারাপ অনুকরণ—এর নমুনা হচ্ছে বৃটিশ জেলের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মন্দ অনুকরণ।

সবচেয়ে জরুরী হল নতুন সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্দীদের দেখা। তাদের অপরাধমূলক মনোবৃত্তিকে মানসিক বিকৃতি বলে মেনে নিয়ে সংশোধনের উপায় খুঁজে নেওয়া। শুধু শাস্তি দেওয়া নয় সংশোধনই হওয়া উচিত জেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আমি নিজে বন্দী না হলে অন্য বন্দীদের প্রতি এই সহানুভূতিবোধ করতাম কী না জানি না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা যদি এই বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন তাহলে

তাঁরা বহুভাবে উপকৃত হবেন। কাজী নজরুল ইসলাম জেলে থেকে জেল-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সেই কারণে তাঁর কবিতা যে কতটা সমৃদ্ধ হয়েছিল তা বোধহয় আমরা ধারণাও করতে পারব না।

আমি যখন মন শান্ত করে ভাবতে বসি তখন নিজের ভেতরে এই আশ্বাস পাই যে আমাদের যত দুঃখ, যত হতাশা তার গভীরে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করছে। আমাদের জীবনের কষ্ট কী তার তীব্রতা হারাবে না? জেলখানায় বন্দী হয়েও আমরা কী চরম আনন্দ অনুভব করব না? কিন্তু তা সম্ভব নয়। সেই কারণে আত্মা ও শরীরের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

সাধারণত একপ্রকার দার্শনিক ব্যাকুলতা কারাগারের পরিবেশে আমাদের মনে বল সঞ্চার করে। যে কারণেই হোক, আমি অন্তত এইরকম অনুভব করি। দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে আমার যেটুকু জ্ঞান, তার সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমার যা ধারণা সেইটুকু জুড়ে এই প্রবাস জীবন সহনীয় করে নিয়েছি। কোনো মানুষের কাছে যদি চিন্তন ও মননের জন্যে যথেষ্ট বিষয় থাকে এবং যদি তার শরীর ভেঙে না পড়ে, তাহলে কারাবাস তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু আমাদের পীড়া শুধুমাত্র মানসিক নয় এবং এই কারণেই আমরা অসহায়, কারণ যেহেতু শরীরও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেই কারণে আত্মার আকুলতা যে দিশাতেই যাক, শরীর তাকে সঙ্গ দিতে পারে না।

লোকমান্য তিলক তাঁর গীতা-ভাষ্য কারাগারে বন্দী অবস্থায় লিখেছিলেন। আমি নিশ্চিত জানি যে তিনি মানসিক প্রসন্নতায় দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত যে দীর্ঘ ছয় বছর মানডালের জেলে থাকার জন্যেই তাঁর অকালে দেহাবসান হয়েছে।

একজন বন্দীকে বাধ্য হয়ে একান্ত নিঃসঙ্গতায় দিন কাটাতে হয়, সেই কারণে সে জীবনের চরম সমস্যাগুলির বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ পায়। নিজের বিষয়ে এই কথা জোর গলায় বলতে পারি যে অত্যন্ত জটিল কতগুলি প্রশ্ন, যা আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ঘূর্ণীর মতো পাক খায়, সেগুলি এখন ধীরে ধীরে সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতীতে ধাঁধার মতো যে সব বিষয়ের সমাধান বহু কষ্টে করতে পেরেছি, অথবা যে চিন্তাগুলি শুধু রাখার জন্যেই মনের মধ্যে রেখেছিলাম, ক্রমশঃ সেগুলির

উপর সুস্পষ্ট অধিকার অনুভব করছি। অন্য কোনো কারণে না হলেও শুধুমাত্র উপরোক্ত কারণে আমি অনুভব করি যে কারাবাস আমাকে আধ্যাত্মিক ভাবে লাভবান করবে।

তুমি আমার নজরবন্দী হওয়াকে আত্মত্যাগের সংজ্ঞা দিয়েছ। এর থেকে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে তোমার মনে সহানুভূতির ফল্গুধারা বইছে এবং তোমার হৃদয় বিশাল। কিন্তু যেহেতু আমি মনে করি আমার মধ্যে কিছুটা কৌতুকপ্রিয়তা ও মানসিক স্থৈর্য রয়েছে, অতএব আত্মত্যাগের মতো মহৎ কর্মের দাবীদার কেমন করে হই? অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা থেকে সর্বদা সাবধান থাকতে চাই। কতটা সফল হতে পেরেছি তার বিচার আমার বন্ধুরা করবে। সে যাই হোক, অন্তত আমার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ একটি আদর্শ হয়েই থাকবে।

আমি বুঝতে পারি যে দীর্ঘকালের জন্যে যে ব্যক্তি কারাগারে বন্দী থাকে, তার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে তার বার্দ্ধক্য তাকে অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে। এই কারণে তার খুব সাবধানে থাকা উচিত। তুমি কল্পনাই করতে পারবে না যে দীর্ঘ কারাবাস কীভাবে মানুষের শরীর ও মন অসময়ে জর্জরিত করে। নিঃসন্দেহে এর জন্যে অনেক কিছুই দায়ী. যেমন সুখাদ্য, ব্যায়াম ও অন্যান্য সুবিধার অভাব; একান্তবাস, অধীনতার অনুভূতি, নিঃসঙ্গতা এবং সবশেষে সঙ্গীতের মতো একটি মহান বস্তুর অভাব। কিছু রিক্ততা মানুষ নিজ অন্তরে নিজেই পূরণ করে নেয়। কিন্তু এই বস্তুগুলি থেকে বঞ্চিত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অকাল বার্দ্ধক্যের কারণ হয়। আলিপুর জেলে ইয়োরোপীয় বন্দীদের জন্যে প্রতি সপ্তাহে সঙ্গীতের আয়োজন হয়, এখানে আমাদের জন্যে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। এ কথা না বলে পারছি না যে কোনো বন্দীর জীবনে তার বন্ধু ও আত্মীয় পরিজনের সদিচ্ছা ও সহানুভূতি একটি বড় সম্বল। যদিও এগুলি তার মনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে, তবু আমি নিজেকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছি যে আমি একটুও ভুল বলিনি। রাজনৈতিক বন্দী ও সাধারণ কয়েদী জীবনের কঠোরতার মধ্যে প্রভেদ আছে। রাজনৈতিক বন্দী জানে যে সে যখন তার কারাবাসের শেষে ফিরে আসবে, তখন সমাজ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে গ্রহণ করবে; কিন্তু সাধারণ কয়েদীর ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। এই পরিস্থিতি

আমার সন্তোষজনক মনে হয় না। একটিও সভ্য সম্প্রদায় কী এই দুঃখী লোকগুলির জন্যে সহানুভূতি অনুভব করে না?

বন্দী-জীবন বিষয়ে আমার ভাবনা চিন্তা দিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কোথাও না কোথাও তো এই চিঠির উপসংহার করতেই হবে। আমার যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকত তাহলে ভারতীয় জেল বিষয়ে একটি পুস্তক লিখতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন কোনো কাজ হাতে নেওয়ার সামর্থ নিজের মধ্যে অনুভব করি না।

আমার ধারণা জেল জীবনের কষ্ট শারীরিকের চেয়ে বেশী মানসিক। যখন অপমান ও অবমাননার আঘাত বেশী নির্মম হয় না, তখন বন্দী জীবনের পীড়া সহ্য করাও বেশী কঠিন হয় না। কিন্তু বারংবার আঘাত এই লজ্জাজনক বিষণ্ণ পরিবেশ বিষয়ে আমাদের সজাগ করে রাখে, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বাহ্য অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে অন্তরের আনন্দময় আদর্শ জগতে লীন হতে হবে।

তুমি লিখেছ কীভাবে সমস্ত পৃথিবী মানুষের অশ্রুতে ভিজে গেছে এ কথা ভেবেই তোমার মন বিষণ্ণ হয়। কিন্তু এর সবটাই বিষাদ ও দুঃখের অশ্রু নয়, এতে করুণা ও স্নেহের অশ্রুবিন্দুও মিলিত রয়েছে। তুমি যদি বিশ্বাস করো যে অফুরন্ত আনন্দ ও সমৃদ্ধি তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছে, তাহলে কী তুমি কষ্ট ও যন্ত্রণা-সঙ্কুল পথ এড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাববে? আমি যতদূর বুঝি, নিরাশ হওয়ার বা সাহস হারিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই, বরং আমি অনুভব করি যে দুঃখ আর কষ্ট থেকে আমরা উচ্চতর পূর্ণতার দিকে সাহস সংগ্রহ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাই। তুমি কী মনে করো যে কষ্ট ও সংগ্রাম না করেই আমরা যে বস্তু লাভ করি তার কোনো স্থায়ী মূল্য আছে?

তোমার পাঠানো বইগুলি পেয়েছি। এগুলি ফেরত দিতে পারব না কারণ পাঠকের সংখ্যা অনেক। বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে যদি এই ধরনের বই আরো পাই তো তাকে স্বাগত জানাব। তোমার নির্বাচন সর্বদাই সুন্দর।

প্রীতি জেনো,

সুভাষ

দিলীপকুমার রায় সমীপে

তিন

ইনসীন জেল
৬ মে, ১৯২৭

শ্রদ্ধেয় দাদা,

লম্বা চিঠি লেখার সাহস পাচ্ছি না, ততটা ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সরকারী প্রস্তাবের ব্যাপারে বড় দাদার সঙ্গে অনেকক্ষণ মন খুলে কথাবার্তা হয়েছে। উনি আমার সব মতামত তোমাকে জানিয়েছেন নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের সুযোগ দেওয়াকে আমি খুব গুরুত্ব দিই, এবং এই অনুগ্রহের জন্যে আমি মাননীয় গৃহ-সদস্যের কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এতদিন আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে এটা তার ব্যতিক্রম, এই ব্যবহারকে স্বাগত জানাই।

বড় দাদা ২৭ এপ্রিল (এখানে থেকে রওনা হওয়ার একদিন আগে) বাংলার সরকারের যে উত্তর আমাকে জানিয়েছেন তাতে প্রশ্ন দুই পক্ষের জন্যেই আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই বলছি যে ১১ এপ্রিল সরকারের প্রস্তাবের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম দ্বিতীয় বার সেই কথাই বলব।

আমার সিদ্ধান্ত জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণাম, আরো গভীর ভাবে চিন্তা করেও এই সিদ্ধান্তেই অচল থাকব। জেলে যত বেশী দিন থাকছি ততই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যে এই সংসারে যত বিবাদ হয়ে চলেছে তার গভীরে শুধু আদর্শের সংঘাত,—মিথ্যা আদর্শের সঙ্গে সত্য আদর্শের, কিংবা হয়ত বলা যায় বাস্তবিকতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অথবা সত্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংঘাত। আদর্শ বা তত্ত্বের দ্বারা মানুষের আন্দোলন সৃষ্টি হয়, আর সেই আদর্শ নিশ্চল নয়, বরং গতিশীল ও আক্রমনাত্মক। ততটাই গতিশীল যতটা হেগেলের 'অ্যাবসোল্যুট আইডিয়া', হার্টমেন ও শপেনহাওয়ারের 'ব্লাইণ্ড বিল' এবং হেনরী বার্গসঁর 'ইলান ভাইটাল'। আদর্শ নিজের নিয়তি নিজেই নির্মাণ করে, আর আমরা, যারা মাটির ঢেলা মাত্র, যাদের মধ্যে দিব্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে—আমাদের শুধু এই আদর্শের প্রতি সমর্পিত হতে হবে। এই প্রকার সমর্পিত জীবন

আমাদের পার্থিব ও শারীরিক অস্তিত্বের ওঠা-নামা সত্বেও পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমি যে আদর্শকে গ্রহণ করেছি তার অন্তিম বিজয় সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই কারণে নিজের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যত বিষয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নই।

আমি সরকারের কাছে লেখা আমার চিঠিতে নিজের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছি, এর পরে আর কোনো কুতর্কের অবকাশ থাকে না। সমালোচকরা বলেছেন বড় কিছু প্রাপ্তির আশায় আমি দর-দাম করছি,—এই কথায় দুঃখ পেয়েছি। আমি দোকানদার নই, আর দর-দামও করি না। কূটনীতির পিচ্ছিল পথকে আমি ঘৃণা করি, কারণ আমার স্বভাবের সঙ্গে তার মিল নেই। আমার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি এই মীমাংসায় উপস্থিত হয়েছি, আর এইটাই শেষ কথা। আমার শরীরকে আমি এতটা গুরুত্ব দিই না যে দরদাম করে তা বাঁচানোর চেষ্টা করব। মূল্য বিষয়ে আমার ধারণা বাণিজ্যিক ধারণা থেকে ভিন্ন। আমি মনে করি না জীবনের সফলতা বা বিফলতার নির্ধারণ শারীরিক বা পার্থিব মানদণ্ড দ্বারা করা উচিত। আমাদের যুদ্ধ শারীরিক যুদ্ধ নয়, আর কোনো পার্থিব লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্যেও নয়। সেন্ট পল যেমন বলেছেন, 'মানুষের বিরুদ্ধে নয়, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে, এই পৃথিবীর অন্ধকারের শাসকদের বিরুদ্ধে, উচ্চ শ্রেণীতে আত্মিক অবনতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলেছে।' আমরা স্বাধীনতা ও সত্যের দাবী জানিয়েছি। যেমন রাত্রির পরে দিনের আসা সুনিশ্চিত, ঠিক সেইভাবেই আমাদের সিদ্ধান্তের বিজয় সুনিশ্চিত। আমাদের শরীর নষ্ট হতে পারে, কিন্তু যদি আমাদের আস্থা দৃঢ় ও ইচ্ছা অজেয় হয় তাহলে আমাদের বিজয় হবেই। আমাদের মধ্যে কজন এই সমগ্র প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সফল হতে দেখবেন, তা ঈশ্বরই বলতে পারেন। নিজের বিষয়ে এইটুকুই বলতে পারি যে আমি নিজের জীবন নিজের মতো করে বেঁচে আর বাকী সব কিছু অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়েই সুখী।

শেষ করার আগে আরো একটা কথা। আমার চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাওয়া উচিত হবে কী না সেই সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমি সুইজারল্যাণ্ড যাওয়ার জন্যে শারীরিক ভাবে সক্ষম নই, ভারতের কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় প্রারম্ভিক চিকিৎসার জন্যে আমার যাওয়া প্রয়োজন। এই চিকিৎসার কতদিন পরে বিদেশ যাত্রা

করতে পারব জানিনা। একটি ব্যাপার নিশ্চিত, তা হল, যতদিন না আমার স্বাস্থ্যের বেশ কিছু উন্নতি হচ্ছে, ততদিন ডাক্তারের পরামর্শ মতো সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ভারতের কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে যদি আমি বেশ ভালোভাবে সুস্থ হয়ে উঠি, তাহলে হয়তো বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজনই হবে না,—অবশ্য একথা আলাদা যে আমি স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করা অস্বীকার করতে পারি। তাছাড়া অর্থের প্রশ্নও আছে,—নিজের পকেটটাও দেখতে হবে, যেটা খুব বেশী ভর্তি নয়। অনিশ্চিত কালের জন্যে বাড়ি ও নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবে দেখার আগে আমাকে নিজের পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে আমার মা-বাবার মত নিতে হবে। ভারতের রাজনৈতিক স্থিতি আগামী কয়েকমাসের মধ্যে বদলাতে পারে, আবার এমনও হতে পারে বাংলার সরকার স্বেচ্ছায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে চাইলেন। কোনো অন্তিম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, অতি সাবধানে এই সব কথাগুলি ভেবে দেখতে হবে। সব কিছু বিবেচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে নিজেকে স্বাধীন বলে ভাবতে চাই। আমি চাইবো না যে আমাকে তাড়াহুড়ো করে দেশের বাইরে পাঠানোর জন্যে ওয়ারেন্ট সই করিয়ে নেওয়া হোক। যদি আমাকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠানো সরকারের পক্ষে আবশ্যক শর্ত হয়, তাহলে তুমি সেই শর্ত ভাঙতে কিছুমাত্র দ্বিধা কোরোনা। ঈশ্বর মহান, এবং তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নিজের গড়া খেলনা—মানুষের চেয়ে বেশী মহান। যদি আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি তাহলে কোনো দুঃখ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

আমার একথা ভেবে দুঃখ হয় যে আমার জন্যে কত স্নেহময় ও সহানুভূতিশীল মনকে এত দুঃখ ও দুশ্চিন্তা সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু আমি এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে একই মাতৃভূমির (আমি পিতৃভূমি বলব না) প্রতি বিশ্বস্ত, একই সম্পদের উত্তরাধিকারীদের নিজের আনন্দ ও শোক ভাগ করে নিতে হবে।

আশাকরি তোমরা সকলে ভালো আছ।

তোমার স্নেহের

সুভাষ

শ্রী এস. সি. বোস সমীপে

৩৮/১, এলগিন রোড, কলকাতা

একটি চিঠি

জেল কুঠুরি
পোর্ট ব্লেয়ার
১৫-২-১৯১৪

প্রিয়বর 'বাল',

এসো ভাই, এক বছর পরে সেই সুখের দিন এসেছে। জেলখানায় বন্দী মানুষ বাড়ি থেকে চিঠি পেতে অথবা বাড়িতে চিঠি লিখতে এত আনন্দ পায়! এই কাজ এত প্রিয়, এত মধুর, যেন সমুদ্রের ধারে, ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় নিজের প্রিয়তমের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু দাঁড়াও ভাই. ঘন্টা বাজছে, আমাকে খাবার জন্যে যেতে হবে।

আমি জেলে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আহার করে ফিরছি। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম বাড়িতে চিঠি পাঠানোর দিনটি কত মধুর। আমার কাছে তা নববর্ষের দিনের মতন। আমি আমার বছর সেই দিন থেকেই গুণতে শুরু করি, কারণ সেই দিন আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমি নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহ লাভ করি, যে কারণে আবার এক বছর হেসে খেলে জীবন কাটাতে পারি। আমি দুঃখিত যে এর আগে আমি তোমাকে চিঠি লিখিনি, আর তোমাকে কষ্ট করে টেলিগ্রাম করতে হয়েছে। এখানকার কর্তাব্যক্তিরা কৃপা করে তোমার টেলিগ্রামের খবর আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ভাই, যদিও এক বছর কেটে গেছে আর আমার চিঠি লেখার অধিকারও ছিল, তবু আমাদের ডাক-বিভাগ এত বিচিত্র যে চিঠি লেখার দীর্ঘকাল পরে সেই চিঠি কলকাতায় পৌঁছয়। অনেক সময় চোদ্দ মাস পর্যন্ত চিঠি পৌঁছয় না। কিন্তু তোমার চিঠি বিংশ শতাব্দীর ডাক পদ্ধতিতে শীঘ্রই এসে পৌঁছয়। তোমার চিঠিতে একথা জেনে সুখী হলাম যে তোমার স্বাস্থ্য ভালো আছে এবং তুমি সম্মানের সঙ্গে সাফল্য লাভ করেছ। পরীক্ষায় সাফল্য পাও বা না পাও স্বাস্থ্য খারাপ কোরো না। আমি চাই তুমি



বীর বিনায়ক সাবরকর

স্বাস্থ্যবান, তেজস্বী, কর্মঠ ও শক্তিশালী হও। যৌবনের প্রথম প্রকাশ হচ্ছে তোমার মধ্যে। এই সময়ে জীবনী শক্তির প্রবাহ বয়ে যায়। এই অবস্থায় বেশী কাজ করে অথবা শরীরের এক ভাগ বেশী প্রয়োগ করে, অন্য ভাগকে নষ্ট কোরো না। শরীর ও মস্তিষ্কের সমান বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। তুমি নিজে ডাক্তার, আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের তোমাকে স্বাস্থ্য রক্ষার কথা বলা কিছুটা অসংগত। কিন্তু ভাই, যৌবন অন্ধ। আমরা প্রায়ই যৌবনে প্রবাহিত জীবনী-শক্তি এবং ক্রমশ বেড়ে ওঠা শরীরে শক্তি সংগ্রহ করতে ভুলে যাই। আমাদের এমন ভাবে কাজ করা উচিত যাতে বার্দ্ধক্যের শীত ঋতুতে আমরা আমাদের সংগৃহীত শক্তি কাজে লাগাতে পারি। আর যদি এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ তুমি দুর্বল হয়ে পড়ো, তোমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে, তোমাকে লাঠির সাহায্য নিতে হয়, তাহলে আমাকে বলতে হবে, ‘বৈদ্যরাজ, আপনি নিজের চিকিৎসা করুন।’ (মনে মনে হেসো না যেন!) আমি বৈদ্য নই, সেইজন্য আমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে। তবে কোনো চিন্তা নেই, কারণ সব উকিলেরই (বীর সাবারকর ব্যরিস্টার ছিলেন) চোখ খারাপ হয়; যদি না হয় তো হওয়া উচিত! আমার গর্ব হয় কারণ আমার কয়েকজন বন্ধু বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। খুব ভালো কথা! কিন্তু এর চেয়েও ভালো হবে যখন তারা কর্তব্যের ক্ষেত্রেও ভালো করে যুদ্ধ করে জয়লাভ করবে, যখন সেই ক্ষেত্রেও তাদের স্বর্ণপদক প্রাপ্তির যোগ্য মনে করা হবে এবং পুরস্কৃত করা হবে। মানব জগতের বিশাল সংগঠনের কাছে পাওয়া স্বর্ণপদকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পুরস্কার তুচ্ছ! সেই বন্ধুদের মধ্যে অনেকের চিঠির প্রতীক্ষা করি, কারণ আজও আমি তাদের ভুলিনি। যারা স্বেচ্ছায় তোমাকে জানাবে, তাদের নাম ও তাদের কথা আমাকে জানিও।

তোমার পাঠানো বইগুলি ভালো লেগেছে। ‘মহাত্মা পরিচয়ে’র অনুবাদ ভারী সুন্দর হয়েছে! দু’ লাইনের ভূমিকাও কত বিনয়পূর্ণ এবং যথার্থ—‘ধনীর সম্পদ, আমি ধনভাণ্ডার ভেঙে উঠিয়ে এনেছি। আমি মোট বওয়া মজুর মাত্র।’ কথাটা খুব ভালো লাগল। ‘জাইচা মণ্ডপ’ দশ-বারো পৃষ্ঠা পড়েছি। তার প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক শব্দ আমার হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে এক সুরে স্পন্দিত হচ্ছে। আমি জানি এর লেখক কে হতে পারে। বইটিতে যে ভাব

প্রকাশিত হয়েছে, ভাষাও তার অনুরূপ। ভাব কবিত্বপূর্ণ, উৎকৃষ্ট এবং বিষয়ের উপযুক্ত; বিষয় এই দুইএর অনুরূপ। আমি চাই 'ভারত গৌরব গ্রন্থমালা'র মতো লোকপ্রিয় প্রকাশন সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে পারে এবং চলতি প্রবাহে ভেসে না যায়। হালকা বিষয়বস্তু জনপ্রিয় হয়; কিন্তু দায়িত্ববান ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব বোঝা উচিত। মাঝে মাঝে রাজনীতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক, যেমন জন স্টুয়ার্ট মিলের 'প্রতিনিধিক শাসন' ইত্যাদি প্রকাশ করা উচিত। বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মত এই যে আমাদের মতো লোকের এই ধরনের পুস্তক নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই। আমেরিকার লোকেদের বেদান্ত চর্চা করা প্রয়োজন, ইংলণ্ডের লোকেদেরও। কারণ তারা নিজেদের জীবন সুসম্পন্ন এবং বীরত্বপূর্ণ করেছে, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত করেছে এবং ব্রাহ্মণত্বের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে অবস্থায় আধ্যাত্মচর্চা করার এবং সেই সঙ্গে তা অনুভব করার যোগ্যতা থাকে। ভারতবর্ষের সেই যোগ্যতা নেই। আমরা সকলেই এখন শূদ্র,—বেদ বা বেদান্ত পাঠে আমাদের অধিকার নেই।

শূদ্রদের বেদ পাঠে অধিকার না থাকার কারণও তাই। নিশ্চয়ই জেনো নির্দয়তা, সংকীর্ণ হৃদয়তা অথবা স্ব-হিত রক্ষার জন্যে শূদ্রকে পৃথক করা হয়নি। অন্যথায় সেই ব্রাহ্মণরাই আধ্যাত্মবিদ্যাকে আরো অধিক সরলভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পুরাণ রচনা করতেন না। সকল রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আমরা এই উচ্চ চিন্তাধারার যোগ্য নই, কারণ একথা সকলেই জানেন যে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া বিখ্যাত বৈদান্তিক ছিলেন, এবং সম্ভবত সেই কারণেই রাজত্ব এবং 'পেনশনে'র মধ্যে পার্থক্য জানতেন না। আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করা উচিত। এই সংসারে যোগ্য হয়ে থাকা উচিত। গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য পূরণ করো, তারপরেই বানপ্রস্থাশ্রম এবং তৎসম্বন্ধীয় তত্বচর্চা আরম্ভ করো। ঐ সব গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা যাই হোক না কেন, এগুলি বিধবা, বৃদ্ধ, পেনসনভোগী এবং প্রত্যক্ষ কার্যক্ষেত্র থেকে যারা দুরে আছে তাদের জন্যেই রেখে দেওয়া উচিত। এইসব লোকেদের প্রাচীন গ্রন্থ তথা ঈশ্বর আত্মা মানব সম্বন্ধীয় পুরাতন ধাঁধার মধ্যে থাকতে দাও। যুবকদের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে চিন্তা করা উচিত। বেদান্ত চর্চায় কী লাভ! বেনারস আজ পর্যন্ত কোনো শহীদের

জন্ম দেয়নি, দেশের জন্যে একটা পাইও দিতে পারেনি।

এবার নিজের সম্বন্ধে কিছু জানাই। গত এক বছরে আমার কোনো অসুখ করেনি। আমার স্বাস্থ্য ভালোই আছে, আর জেলে তো কারুর ওজন বাড়তে পারে না। তবে চিন্তা কোরোনা। এই ছোট কুঠুরির হাওয়া-ঘরে আমি খুব ভোরবেলা উঠি। ঠিক সময়ে আর ঠিক পরিমাণে প্রাণায়াম ও ভোজন করি। আসলে এইসব করতেই হয়। অতএব 'সকাল সকাল ঘুমিয়ে ও সকাল সকাল জেগে' স্বাস্থ্য ভালোই থাকে। ওহে ভাবী ডাক্তার! তুমি তোমাদের রুগীদের জন্যে এর চেয়ে ভালো সময়-বিভাগ করতে পারবে না। আমার শরীরের স্বাস্থ্য ভালোই আছে, মনের স্বাস্থ্য তার চেয়েও ভালো। কাজ হাল্কা বা ভারী যেমনই পাই, আমি সেটা করতে ভিড়ে যাই, আর সব সময়ে মনে মনে গুনগুন করি—

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ
সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'
অথবা
'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং
যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য
সিদ্ধিং বিংদন্তি মানবাঃ।'
অথবা
'সর্বারম্ভা হি দোষেণ
ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ!!
ইত্যাদি

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা (আজকাল আমি যে কুঠুরিতে রয়েছি সেখান থেকে আকাশ দেখা যায়) অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বল আলো ও ছায়ার ঐশ্বর্য দেখি আর পশ্চিম আকাশে পদ্মের মতো গোলাপী আলোর ছটা দেখতে দেখতে নিজেকে ভুলে যাই। কখনো এক বিষয়ের চিন্তা করি, কখনো অন্যের। কখনো কবির সঙ্গে বলি :

'একতস্তটতমালিনীম্। পশ্য ধাতুরসনিম্নগামিব' অথবা 'তেন মানিনি মমাত্র গৌরবম্' আবার কখনো আদর্শবাদী তত্বজ্ঞের মতো গভীর চিন্তায়

নিমগ্ন হই। যারা বলে দৃশ্যমান সব প্রেমই আত্মগত প্রেম, আমি অন্তত তাদের মতো বহির্প্রেমিক নই। তাদের কথা জানি না। আমি পূর্ণরূপে সুখী, ততটাই সুখী যতটা কোনো পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে বাইরে ছিলাম। আর যদি কখনো আমার মন বালকের মতো ব্যথিত হয় ও চোখের জল বইতে থাকে, তখন বুড়ি ঠাকুমা বিচারশক্তি এসে হাজির হয়, আর হেসে বলে, 'বাছা, তোর কী হয়েছে? মহাত্মাকাঙক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার ইচ্ছে না তোর? ঐশ্বর্যের রথে বসতে চাস না? যদি চাস, তাহলে ঠিক হয়েছে! তোর হেরে যাওয়াই ভালো। এমন স্বার্থপর অনীতিজ্ঞের হেরে যাওয়াই উচিত। আমি জানি, ঈশ্বর জানেন যে ব্যক্তিগত রূপে তুমি কোনো কিছুর প্রত্যাশী নও; না নামের, না যশের, না ভূমির, না ধনের, না সুখের। তুমি চেয়েছিলে অত্যন্ত বেশী সহনশীল হতে। অন্তত আমার সামনে তো তুমি তাই বলতে। অন্যর জন্যে, মনুষ্য মাত্রের জন্যে, তুমি অত্যধিক কষ্ট সহ্য করতে চেয়েছিলে। তাহলে বল, নিরাশ কেন হলে? তুমি 'যজ্ঞ সর্বস্বদক্ষিণম্' বলেছ। অসীম কষ্ট সহ্য করছ। সময়ের সীমা নেই। তোমার কোনো সময় এমন কাটে না যখন তুমি মানব জাতির শুদ্ধির জন্য কষ্ট না সহ্য করে কাটাচ্ছ। তোমার তো প্রসন্ন হওয়া উচিত এর চেয়ে বেশী তুমি আর কী করতে পারতে!' এই শুনে আমার মন আবার পাখা মেলে দেয়। সে উড়তে থাকে, অনেক উপরে উঠে যায়, আরো উপরে ওঠে। আর যদি মনে অহঙ্কার হয়, তখন বুড়ি ঠাকুমা এই সংসার দেখিয়ে বলে, 'এই হিমগিরি দেখো। একটা সময় ছিল যখন সে এখানে ছিল না, আবার একটা সময় আসবে যখন সে থাকবে না। এই চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডল দেখো।' তখন আমার ছোট মনটা হারিয়ে যায়, নিজেকে ভুলে যায়, বিরাট বিশ্বে বিলীন হয়ে যায়, ব্যক্তিগত মহত্ব এবং স্বার্থ চিন্তার জন্য লজ্জিত হয়।

অতএব প্রিয় 'বাল'! আমরা দুই ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে আছি। আমাদের নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগত ভাবে সংসারে যদি কোনো কিছু আমাদের তৃপ্ত করে তা হলো তোমার স্বাস্থ্য ও তোমার কুশল। যদি তুমি এই দুটি ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিন্ত করো, অথবা করার চেষ্টা করো, তাহলে পরিণামের চিন্তা না করে আমরা যথার্থ সুখী হব। এখন পর্যন্ত জেলের কোনো ছায়া আমাদের উপর পড়েনি। আমাদের

উপর কোনো কুপ্রভাব পড়েনি। স্বাস্থ্য এখানে থাকার জন্যে নয়, বরং এখানে থাকা সত্বেও ভালো আছে। তুমি লিখেছ যে তুমি কর্তৃপক্ষদের কাছে চিঠি লিখে এখানে আসার সময় জানতে চেয়েছ। এখানকার নিয়মানুসারে আমার এতদিনে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দ্বীপে থাকার অনুমতি পাওয়া উচিত ছিল, কারণ এখানকার কর্তাব্যক্তিরা আমার ব্যবহার ভালো বলেছেন, তবু আমাদের দুজনকে ছাড়া হয়নি। আমি সরকারের কাছে প্রার্থনা করছি তোমাকে যেন আন্দামানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রার্থনা স্বীকার হবে বলে মনে হয় না। যদি তুমি আমাদের বিষয়ে কিছু জানতে চাও, তাহলে কর্তৃপক্ষের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারো। কিছুদিন পরেই বড় দাদার (বড় ভাই বাবা সাবরকর) এখানে থাকার পাঁচ বছর পূর্ণ হবে, তখন জেলের নিয়ম অনুসারে তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে। কিন্তু আমার সঙ্গে নয়। এরা মনে করে আমি অতি ভয়ানক অপরাধ করেছি। আমাকে কুঠুরি থেকে মুক্ত করা, কিংবা আমার আত্মীয়স্বজনকে আমার সঙ্গে এখানে থাকার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে এখানকার কর্তৃপক্ষ কিছু করতে পারেন না। হ্যাঁ, অন্য অপরাধীদের জন্যে তাঁরা সবকিছু করতে পারেন। এ ব্যাপারে তাঁদের দোষ নেই। আমার ধারণা আমার বিষয়ে সব হুকুম সরাসরি ভারত সরকারের কাছ থেকে আসে। যখন এখানকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাবেনা, তখন তুমি ভারত সরকারের কাছেই চিঠি লিখো। তুমি আমার জন্যে বেশী ঝামেলায় জড়িয়ে পোড়ো না। আমার ধারণা, যাতে ভারত সরকারের হিত তিনি স্বয়ং তাই করবেন। আমরাও তাঁকে মাঝে মাঝে স্বরণ করিয়ে দেব। এর চেয়ে বেশী কিছু করা মানে ব্যর্থ সময় নষ্ট করা। তুমিও নিজের স্বাস্থ্য ও কুশলের চিন্তা করো। আমি তোমাকে হাইকোর্টে যা বলেছিলাম তা স্মরণ করে বড় আনন্দ হল।

যমুনাকে বোলো এই চার বছরে নতুন আশার কিরণ দেখা দেবে। এই কারণে তার সুন্দর হৃদয় বা বোনের কোমল হৃদয় যেন ধৈর্য ধারণ করে। ঠিক তেমনি ধৈর্য ধরে যেমন এতদিন ধরে সায় আসছে। ওদের সব ধরনের মারাঠি সাহিত্য পড়তে দাও। পৌরাণিক গ্রন্থ নয়, বরং জীবনের উচ্ছ্বাসে ভরা যে জীবন-সাহিত্য গ্রন্থ বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমে প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলি

তাদের পড়তে দাও। আমার সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু সখারামের (সখারাম গোর্হে 'নাসিক ষড়যন্ত্র কেসে অভিযুক্ত ছিলেন, হাইকোর্টে তিনি খোলাখুলি পুলিসের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন। পাঁচ বছরের জেল হয়েছিল—এবং শহীদের মতো জেলেই মৃত্যু হয়েছে।) মৃত্যু সংবাদ শুনে গর্ব ও দুঃখে আমার মন ভরে উঠল। তুমি হয়ত জানো যে হাইস্কুলের সময়ে আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল। সখারাম বীরের মতো বেঁচে, বীরের মতোই মারা গেল। এর চেয়ে বেশী আর কী চাওয়ার আছে? তাঁর স্ত্রী জানকী বৌদিকে আমি কখনো দেখিনি। তবে তোমার বর্ণনাতেই তাঁর পরিচয় পেয়ে গেলাম। তাঁর সম্বন্ধে আমি যা অনুভব করি তা হল যে তিনি অভাগিনী বা দুঃখিনী নন, বরং তিনি একা থেকে এই সংসারের পবিত্রতম কর্তব্য করার জন্যেই জন্ম নিয়েছেন।

পুনশ্চ :

তোমার কথামতো তোমার বৌদিকেও দু-চার কথা লিখে দিলাম।

প্রিয় যমুনা,

জেলের নিয়ম অনুসারে শুধু একটি চিঠি লিখতে পারি, এ কথা তো তুমি জানো। এই চিঠিটা 'বাল'কে লেখা জরুরী ছিল। তোমাকে আলাদা চিঠি না লেখার এইটুকুই বাধা ছিল। আমাকে ভুল বুঝবে না এই বিশ্বাস আছে আমার। তোমার স্মৃতি ভুলতে চেয়েও মানস-পটে বার বার ফিরে আসে।

তোমার ত্যাগ আর ধৈর্য তো—বিদায়ের দিন বম্বেতে যা বলেছিলাম—অদ্বিতীয়। তুমি তাকেই আধার ও মানদণ্ড মেনে নিয়ে নিজের জীবন ধন্য মনে করতে পারো, আবার সংসারের বিকার প্রবল হলে নিজেকে অভাগিনী মনে করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তোমার, কারণ আমি তোমাকে দুঃখ ও কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিনি। কিন্তু তুমি নিজের জন্যে কোন পথটি বেছে নেবে তাও আমি জানি। আমার কুশল সংবাদ বালের চিঠিতেই পাবে।

একান্তভাবে তোমারই অনুরাগী

বিনায়ক

দুটি চিঠি

এক

(১৯২৩ সালে, প্রথমবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ভগত সিং এই চিঠিটি তাঁর পিতা সর্দার কিষণ সিং-এর জন্য রেখে গিয়েছিলেন)

পুজনীয় বাবা,

প্রণাম।

আমার জীবন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। সাংসারিক সুখ ও ইচ্ছে আমাকে আকর্ষণ করে না।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ছোটবেলায়, আমার পৈতার সময়, দাদু বলেছিলেন যে আমাকে দেশসেবার জন্য দান করা হল। আমি তাঁর সেই দান সার্থক করতে যাচ্ছি।

আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আপনার স্নেহের
ভগত সিং

দুই

দিল্লি জেল
২৬ এপ্রিল, ১৯২৯

পুজনীয় বাবা,

বন্দে মাতরম!

২২ এপ্রিল আমাদের পুলিশ হাজত থেকে দিল্লির জেলে বদলি করা হলো আর এখন আমরা দিল্লির জেলে রয়েছি। ৭ মে জেলের মধ্যেই মোকদ্দমা শুরু হবে। মনে হয়, একমাসের মধ্যেই নাটক শেষ হবে। বেশী



ভগত সিং

চিন্তা করবেন না। আমি শুনেছি, আপনি এখানে এসেছিলেন, উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, আমার সঙ্গেও দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। জামা-কাপড়গুলো পরশু পেয়েছি। এবার যেদিন আসবেন, দেখা হবে। উকিল-টুকিলের দরকার নেই। দু' একটা ব্যাপারে একটু পরামর্শ করতে চাই। সেটাও এমন কিছু জরুরী নয়। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করবেন না। দেখা করতে যদি আসেন তো একলাই আসবেন। মাকে সঙ্গে আনবেন না। মা কান্নাকাটি করলে আমার খুব কষ্ট হবে। আপনার সঙ্গে দেখা হলে বাড়ির সব খবর জানতে পারব।

হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয় তবে আমার বইগুলোর মধ্যে থেকে 'গীতা-রহস্য', নেপোলিয়নের জীবনী আর কিছু ভালো ইংরিজি নভেল নিয়ে আসবেন।

মা, বৌদি, ঠাকুমা ও কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। রণবীর সিং ও কুলতার সিংকে নমস্কার। দাদুর চরণে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। আজকাল পুলিশ হাজতে আর জেলে আমাদের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। আপনার ঠিকানা জানিনা, তাই কংগ্রেস অফিসের ঠিকানায় চিঠি পাঠালাম।

আপনার স্নেহের
ভগত সিং

অন্তিম কালের কথা

হে দেশ, চেয়ে দেখো, এই
বধ্যভূমিতে সকলেই
প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।
দেশের জন্য আত্মত্যাগ
করার বাসনা প্রত্যেকের মনে ॥
নির্দয় তোমার বন্ধুরা
আর নির্যাতিত তুমি।
দেখা যাক, হত্যাকারীর
হৃদয়ে কতটা সাহস আছে ॥
প্রলয় গর্জনে যেন
মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে।
শহীদ হয়ে যাওয়ার
সুতীব্র ইচ্ছা
'বিস্‌মিলে'র প্রতিটি শিরায় ॥

এই পংক্তিগুলো লিখছি আজ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭; আর ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৭, সোমবার, সকাল সাড়ে ছটায়, এই শরীরটাকে ফাঁসীতে ঝোলানোর সময় নির্দ্ধারিত হয়েছে। অতএব নির্দিষ্ট সময়ে এই লীলা সংবরণ করতেই হবে। এই সবই তো সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর লীলা। সব কাজ তাঁর ইচ্ছানুসারেই হয়। কে কী ভাবে শরীর ত্যাগ করবে তা সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের নিয়মের পরিণতি মাত্র। মৃত্যুর সকল আয়োজন নিমিত্ত মাত্র। কর্মের ক্ষয় যতদিন না হয়, ততদিন আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে বাঁধা পড়তেই হবে—এ হলো শাস্ত্রের নিয়ম। পরমব্রহ্মই জানেন আমার আত্মা কোন কর্মের পরিণতি স্বরূপ কিসের শরীর ধারণ করবে। কিন্তু আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে আমি উত্তম শরীর ধারণ করে, নবীন শক্তি নিয়ে অতি শীঘ্র

ভারতবর্ষেই আমার কোনো নিকট আত্মীয় বা বন্ধুর গৃহে জন্মগ্রহণ করব। কারণ জন্ম-জন্মান্তরে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক মানুষ যেন প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তুর উপর সমান অধিকার লাভ করে। কেউ কারুর উপর হুকুম চালাবে না। সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের স্থাপনা হবে। ভারতবর্ষের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। আমাকে পর পর বেশ কয়েকবার এই দেশেই জন্ম নিতে হবে, যতদিন না ভারতবর্ষের প্রতিটি নরনারী সর্বভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা তিনি যেন আমাকে এই দেশেই জন্ম দেন, যাতে আমি পবিত্র বেদ-বাণীর অনুপম ঘোষণা প্রত্যেক মানুষের কানে পৌঁছে দিতে পারি। হয়তো আমি আমার পথ খুঁজে নিতে ভুল করেছি, কিন্তু তাতে আমার বিশেষ দোষ নেই, কারণ আমি একজন অজ্ঞ জীব মাত্র। কেবল সর্বজ্ঞের পক্ষেই ভুল না করা সম্ভব। পরিস্থিতি অনুযায়ী সব কাজ করতে হয় আমাদের। পরমাত্মা যেন পরজন্মে আমাকে সুবুদ্ধি দান করেন। যাতে আমি যে পথে চলি তা ত্রুটিহীন হয়।

কাকোরী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সেশন জজ রায় শোনানোর পরবর্তী ঘটনা এবার উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করছি। ৬ এপ্রিল ১৯২৭ সেশন জজ তাঁর রায় শোনালেন। ১৮ জুলাই ১৯২৭ অযোধ্যায় চীফ কোর্টে আপীল করা হলো। সেখানে কারুর সাজা বাড়ল, আর দু' একজনের কমলো। আপীল হওয়ার আগেই আমি যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) গভর্নরের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম, যাতে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না। চীফ কোর্টের জজের কাছে দয়া ভিক্ষা করে লেখা পত্রেও এই চিঠির উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু চীফ কোর্টের জজ আমার কোনো প্রার্থনাই রাখলেন না। আমার মামলার বাদানুবাদ জেলে বসে আমি নিজেই লিখে পাঠিয়েছি, যা ছাপা হয়েছে। যখন এই বিবরণ চীফ কোর্টের জজেরা শুনলেন, তখন তাঁরা এটি আমার লেখা নয় বলে সন্দেহ করলেন। এই সব কিছুর ফলে অযোধ্যার চীফ কোর্টে আমি মহা ষড়যন্ত্রকারী রূপে চিহ্নিত হলাম। আমার অনুশোচনায় জজেদের বিশ্বাস হলো না। তাঁরা মনে করলেন যদি এই ব্যক্তি (রামপ্রসাদ) ছাড়া পায়, তাহলে আবার এই কাজ করবে। আমার বুদ্ধির প্রখরতা ও জ্ঞানের উপর কিছুটা আলোক সম্পাত করে আমাকে

'নির্দয় হত্যাকারী' নামে বিভূষিত করা হল। কলম ওদের হাতে, যা খুশী তাই লিখতে পারে, কিন্তু কাকোরী মামলায় চীফ কোর্টের রায় আদ্যোপান্ত পড়লে এ কথা বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যায় যে আমাকে কোন যুক্তিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। রামপ্রসাদ সেশন জজের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, অতএব রামপ্রসাদ ঘোর অপরাধী। এখন যে যতই মিনতি করুক তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা চলবে না।

চীফ কোর্টের আপীল খারিজ হয়ে যাওয়ার পরে যথানিয়মে প্রদেশ গভর্নর ও তারপর ভাইসরয়ের কাছে দয়া প্রার্থনা করা হল। রামপ্রসাদ 'বিস্‌মিল', রাজেন্দ্রনাথ লহ্‌রী, রোশন সিং এবং অশফাক উল্লা খাঁকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার সুপারিশ করে যুক্ত প্রদেশ কাউন্সিলের প্রায় সকল নির্বাচিত মেম্বারের সাক্ষর সহ পত্র দেওয়া হল। আমার বাবা আড়াই শো ধনী ব্যক্তি, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জমিদারের সাক্ষর সহ আরেকটি প্রার্থনা পত্র পাঠালেন, কিন্তু স্যর উইলিয়ম মরিসের সরকার কোনো কথাই শুনলেন না। একই সময়ে লেজিস্‌লেটিব অ্যাসেমব্লি ও কাউন্সিল অফ স্টেটের আটাত্তর জন সদস্যও, তাঁদের সাক্ষর সহ একটি প্রার্থনা ভাইসরয়ের কাছে জানিয়েছেন যে কাকোরী মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হোক, কারণ দায়রা জজের সুপারিশ অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অনুতপ্ত হলে সরকার তাদের শাস্তি কমিয়ে দিতে পারেন আমরা চারজন অভিযুক্তই মনস্তাপ জানিয়েছি, কিন্তু ভাইসরয় মহোদয় কর্ণপাত করলেন না।

মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং অ্যাসেমব্লির আরো কিছু সদস্য ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে মৃত্যুদণ্ড রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, এতকিছু হওয়াতে সকলেরই আশা ছিলো যে ভাইসরয় সাহেব মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দেবেন। এই অবস্থায় বিজয়া দশমীর দুদিন আগে জেল থেকে নিঃশব্দে একটি তারবার্তা এলো,—দয়া করা হবে না। সকলের ফাঁসির তারিখ জানানো হয়েছে। জেলের সুপারিনটেনডেন্ট যখন আমাকে টেলিগ্রামটি পড়ে শোনালেন, আমি বললাম, আপনি আপনার কর্তব্য করুন। কিন্তু জেল সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে সম্রাটের কাছে দয়া প্রার্থনা করার জন্যে বললেন। যেসব ফাঁসীর আসামী ভাইসরয়ের কাছে দয়া ভিক্ষা করে পায়না, উনি

তাদের হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে সম্রাটের নামে একটি তার অবশ্যই পাঠান। অন্য কোনো জেল সুপারিনটেনডেন্ট এই কাজ করেন না। এই আর্জি লেখার সময়ে মনে হল ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা যাক। আমি লখনউ-এর উকিল মোহনলাল সাকসেনাকে খবর পাঠালাম। ভাইসরয়ের কাছে করা আপীল খারিজ হয়ে গেছে। একথা বাইরের কেউ বিশ্বাস করেনি। মোহনলাল সাকসেনাকে দিয়ে যেমন-তেমন করে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করালাম। ফলাফল তো আগেই জানা ছিল। সেখান থেকেও আপীল খারিজ হল। ইংরেজ সরকার কোনো কথাই শুনবেন না জেনেও আমি এই প্রতিজ্ঞা পত্র কেন পাঠালাম? কেন আপীলের পর আপীল, আর দয়া প্রার্থনা করলাম?—মনে শুধু এই প্রশ্ন জাগে। আমি জানি রাজনীতি এক দাবা খেলা। দাবা খেলুড়েরা বেশ ভালো করেই জানেন যে প্রয়োজন হলে নিজের ঘুঁটিগুলোকেও মরতে দিতে হয়। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া কিংবা খোলা আদালতে তাদের বিচার চালানোর প্রস্তাব যখন অ্যাসেমব্লিতে করা হয়েছিল, তখন সরকার পক্ষ জোর গলায় বলেছিল যে তাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ আছে। খোলা আদালতে বিচার চালানোয় সাক্ষীদের আপত্তি থাকতে পারে। যদি অর্ডিনান্সের বন্দীরা ভবিষ্যতে কোনো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার লিখিত প্রতিজ্ঞা পেশ করেন, তাহলে সরকার তাদের মুক্তি দেওয়ার কথা ভেবে দেখবেন। বাংলায় দক্ষিণেশ্বর ও শোভা বাজার বোমা মামলা অর্ডিনান্সের পরেই হল। পুলিশের গুপ্ত বিভাগের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের হত্যার মামলা খোলা আদালতে হল। আরো কিছু অস্ত্রের মামলা খোলা আদালতে চালানো হল, কিন্তু কোনো একটি দুর্ঘটনা বা হত্যার কোনো সূত্রই পুলিশ দিতে পারল না। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা খোলা আদালতে পুরো দেড় বছর ধরে চলল। সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য প্রায় তিনশো জনকে উপস্থিত করা হল। পুলিশের অনেক গুপ্তচর ও সাহায্যকারী অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা বা জোর-জুলুমের কথা পুলিশ জানায়নি। এইসব ব্যাপারে পর্দাফাঁস করার জন্যেই আমি লেখাগুলো সরকারকে দিয়েছি। সরকারের কথা অনুযায়ী বেঙ্গল অর্ডিনেন্সের কয়েদীদের বিষয়ে যেমন সরকারের কাছে সবরকম তথ্য প্রমাণ ছিল, আর সরকার তাদের অনেককেই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রকারী

দলের সদস্য ও হত্যাকারী বলে সনাক্ত করেছেন, সেইরকমই কাকোরীর অভিযুক্তরা যখন লিখিত ভাবে প্রতিজ্ঞা করলেন তখন তা গ্রাহ্য করা হল না কেন? আসল কথা ওরা আমাদের বেঁধে মারবে, আর আমাদের সহ্য করতে হবে। আমি তো ভালো ভাবেই জানি যে যুক্ত প্রদেশে যত রাজনৈতিক অভিযোগ আসে তার বিচার পুলিশের গুপ্ত বিভাগের ইচ্ছানুসারেই হয়। বরেলীর পুলিশ কনেস্টবল হত্যার অভিযোগে একটি নিতান্ত নির্দোষ যুবককে ফাঁসানো হয়েছে আর সি.আই.ডি.-র লোকেরা নিজেদের ডায়েরী দেখিয়ে ফয়সালা লিখিয়েছেন। কাকোরী মামলার শেষেও একই ব্যাপার হল। সরকারের সব চাল জেনে নিয়ে তার লম্বা লম্বা ভাষণের রহস্য ফাঁস করার জন্যেই কাজ করলাম। কাকোরী মামলায় দণ্ডিতদের দয়া প্রার্থনা অস্বীকার করার কোনো কারণ সরকারের কাছে ছিল না। সরকার বেঙ্গল অর্ডিনেন্সের অভিযুক্তদের যা করতে বলেছিলেন, কাকোরীর অভিযুক্তরা তাই করল। তাদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিলে দেশের শান্তি ভঙ্গ হত না, কোনোরকম বিপ্লব হওয়ার আশঙ্কাও ছিল না। বিশেষত যখন সারা দেশ জুড়ে অ্যাসেমব্লির হিন্দু-মুসলমান সব সদস্য এর জন্য সুপারিশ করেছিল। অভিযুক্তদের জন্য এত বড় সুপারিশ এর আগে হয়নি। কিন্তু সরকার নিজের ঘুঁটি সোজা রাখতে চায়। তার নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা আছে। স্যর উইলিয়ম মরিস শাহজাহানপুর ও এলাহাবাদের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড নিজে রদ করেছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, আর এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দিন-দুপুরে হত্যা করার সবরকম সাক্ষ্য প্রমাণ মজুদ ছিল। এই শাস্তি এমন সময়ে মাপ করা হল যখন নিত্য-নতুন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেড়েই চলেছে। যদি কাকোরীর অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে অন্য শাস্তি দিলে অন্য অপরাধীদের উৎসাহ বেড়ে যায়, তাহলে এইসব ধর্মীয় দাঙ্গার ক্ষেত্রেও কী তা হয়না? কিন্তু সেখানে তো অন্য ব্যাপার। ভারতবর্ষের অত্যন্ত নরমপন্থী দলের নেতাও শাহী কমিশন সমর্থন করেন নি, সেখানে কোনো ভারতবাসী নির্বাচিত হয়নি। পার্লামেন্টে ভারতের মন্ত্রী লর্ড ওয়র্কনহেড এবং মজদুর দলের অন্য নেতাদের বক্তৃতা শুনলে একথা বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষকে দাসত্বের শিকলে বেঁধে রেখে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে।

প্রাণত্যাগ করার সময়ে একথা ভেবে নিরাশ হব না যে আমাদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমাদের চাপা দীর্ঘশ্বাসের ফলে লর্ড ওয়র্কনহেডের মস্তিষ্কে ঈশ্বর এই চিন্তা এনে দিয়েছেন যে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া কাজে লাগাও, আর ভারতবর্ষকে আরো বেশী শৃঙ্খলিত করো। ওরা চেয়েছিল এক, আর হল অন্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিখ্যাত রাজনৈতিক দল, প্রতিটি হিন্দু এবং বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা এক হয়ে রয়েল কমিশনের নিযুক্তি এবং তার সদস্যদের বিরুদ্ধে ঘোর বিরোধ করল। মাদ্রাজে আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হবে। ভাইসরয় যখন কাকোরী মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের দয়া-প্রার্থনা নামঞ্জুর করলেন, সেই সময় আমি মোহনলাল সাকসেনাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সব নেতারা একত্রিত হয়ে যেন আমাদের স্মরণ করেন। সরকার অশফাক উল্লাকে রামপ্রসাদের 'দক্ষিণ হস্ত' বলেছেন। অশফাক উল্লা কট্টর মুসলমান হয়েও যদি গোঁড়া আর্যসমাজী রামপ্রসাদের বিপ্লবী দলের ডান হাত হতে পারেন, তাহলে কী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নামে প্রতিটি হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের ছোটখাটো স্বার্থ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না?

ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে। আমি আমার কাজ শেষ করেছি। আমি এমন একটি মুসলমান যুবক উপস্থিত করেছি যে সব পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'মুসলমানকে বিশ্বাস করা যায় না'—এখন একথা বলার সাহস আর কারো হবে না। আমার প্রথম পরীক্ষায় আমি সম্পূর্ণ সফল। এখন দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন এই যে আমাদের ফাঁসী হওয়াতে তারা যদি কিছুমাত্র দুঃখিত হয়ে থাকে তাহলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব দল একত্র হয়ে কংগ্রেসকে নিজের প্রতিনিধি মেনে নিক। কংগ্রেস যা স্থির করে তা তারা সম্পূর্ণ সমর্থন করুক। এমন দিন আর দূরে নয় যখন ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর দাবীর সামনে মাথা নীচু করবে, তখন স্বরাজ আর বেশী দূরে থাকবে না। যত কঠিনই হোক, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই আমাদের অন্তিম ইচ্ছা। আমার ও অশফাক উল্লা খাঁ বারমীর একই মত, কারণ আপীলের সময়ে কিছুদিন আমরা দুজনেই লখনউ জেলের ফাঁসীর কুঠুরিতে কাছাকাছি থেকেছি। অনেক কথা বলেছি দুজনে।

গ্রেপ্তারের পরে, শাস্তি হওয়া পর্যন্ত অশফাকের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে একবার আমার সঙ্গে দেখা হোক। ঈশ্বর তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন।

অশফাক উল্লা খাঁ তো ইংরেজ সরকারের কাছে দয়া ভিক্ষা করতেও রাজী ছিল না। তার অটল বিশ্বাস ছিল, করুণাময় খুদা ভিন্ন অপর কারো কাছে দয়া ভিক্ষা করতে নেই। কিন্তু আমার বিশেষ আগ্রহেই সে সরকারের কাছে দয়া প্রার্থনা করেছিল। এর জন্য আমিই দোষী। আমিই প্রেমের পবিত্র অধিকারের দাবীতে অশফাক উল্লা খাঁয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন আমার ভুল স্বীকা'র করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে গোরখপুর থেকে অশফাককে একটি পত্র লিখেছিলাম। ঈশ্বরই জানেন সেই চিঠি সে পেয়েছে কী না। যাক, ঈশ্বর হয়তো এটাই চেয়েছিলেন যে আমাদের ফাঁসী দেওয়া হোক, ভারতবাসীর দগ্ধ প্রাণে জ্বালা ধরুক, সে কাতর আর্তনাদ করে উঠুক, আর আমাদের আত্মা তাই দেখে তৃপ্ত হোক। আমরা যখন নবীন শরীর ধারণ করে দেশ সেবার কাজে যোগ দিতে আসব সে সময় ভারতের রাজনৈতিক স্থিতি যেন পূর্ণরূপে সংশোধিত হয়। জনসাধারণ অধিক সংখ্যায় সুশিক্ষিত হয়। গ্রামের লোকেরা নিজেদের কর্তব্য বুঝতে শেখে।

প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিয়ে আমি যে ব্যর্থ অপব্যয় করিয়েছি, তারও একটি বিশেষ কারণ আছে। আপীলে জানানো হল মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নয়। কারণ কে জানে কার গুলিতে লোকটি মারা গেল। যদি ডাকাতি করার জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সে শাস্তি শুধু আমার প্রাপ্য। কারণ চীফ কোর্টের রায় অনুসারে ডাকাতের নেতা আমিই ছিলাম, আর ডাকাতি আমিই করিয়েছি। অন্য তিনজনকে ফাঁসী দেওয়া উচিত হবে না। অন্য যে কোনো শাস্তি দেওয়া যেত। কিন্তু সে কী করে হবে? ইংরেজের আদালতকে পরীক্ষা করে দেশবাসীর কাছে একটি উদাহরণ রেখে যেতে চেয়েছিলাম, কোনো রাজনৈতিক অভিযোগ চলাকালীন কেউ যেন ভুলেও ইংরেজের আদালতকে বিশ্বাস না করে। ইচ্ছে হলে জোর গলায় সাফাই পেশ করুক। আবার একথাও মনে হয় যে ইংরেজের সামনে সাফাই পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কাকোরী মামলা থেকেই শিক্ষা হোক। এই মামলাতেই সব রকম উদাহরণ পাওয়া যাবে। প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দাখিল করানোর একটি বিশেষ কারণ ছিল। আমি কিছুদিনের জন্য

ফাঁসীর তারিখ পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলাম,—দেখতে চেয়েছিলাম আমাদের যুবকরা কতটা শক্তি রাখে আর আমার দেশবাসী কতটা সাহায্য করতে পারেন। আমাকে বড় বেশী হতাশ হতে হল। শেষকালে ঠিক করলাম জেল থেকে পালিয়ে যাব। এমন হলে সরকারকে অন্য অভিযুক্তদের ফাঁসীর সাজা মাপ করতে হবে, আর যদি না করে, তাহলে আমিই করিয়ে নেব। জেল থেকে পালানোর অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাইরে থেকে কোনো সাহায্য পেলাম না। মনে খুব আঘাত লাগে যখন ভাবি যে দেশের জন্যে আমি এত বড় আন্দোলন করালাম, বিপ্লবী দল গড়লাম, সেখানে আমি প্রাণ রক্ষা করার জন্যে একটি রিভলভারও পেলাম না। একটি তরুণেরও সাহায্য পেলাম না। শেষ পর্যন্ত ফাঁসী হয়ে যাবে। ফাঁসী হবে বলে আমার দুঃখ নেই। ঈশ্বরের তাই ইচ্ছা। কিন্তু দেশের তরুণদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ যে যতক্ষণ ভারতের বেশীর ভাগ লোক সুশিক্ষিত না হয়, তাদের কর্তব্য অকর্তব্যের জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভুলেও যেন কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ না দেয়। দেশের সেবা করতে চাইলে খোলা আন্দোলনে যথাশক্তি নিয়োগ করুক, তা না হলে তাদের এই আত্মত্যাগ সার্থক হবে না। দ্বিতীয় ভাবেই দেশের সেবা বেশী করা যাবে, আর তা সার্থকও হয়ে উঠবে। পরিস্থিতি অনুকূল না হলে আন্দোলনের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। যার ভালোর জন্যে করো সেই তোমাকে মন্দ বলবে, আর তোমাকে চুপচাপ প্রাণ বিসর্জন করতে হবে।

দেশবাসীর কাছে আমার অন্তিম অনুরোধ, তারা যা কিছু করুক, তা যেন সকলে মিলিত ভাবে করে, আর তা যেন দেশের মঙ্গলের জন্য করে। এতেই সকলের ভালো হবে।

মরেছে 'বিস্‌মিল', 'রোশন',
'লহরী', অশফাক অত্যাচারে,
শত শত জন্ম নেবে
ওদের রুধির ধারে।

আত্মকথা থেকে

□□

Laser typeset at Ess Ess Enterprises, New Delhi and printed at I M H Press Pvt. Ltd., New Delhi